Vol. 3 | No. 2 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন

Volume	3
Issue	2
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	December 16, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i2.6
Pages	125-214
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন

Check for updates

মুনীর চৌধুরী

এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, অধুনা দুষ্প্রাপ্য মীর মশাররফ হোসেনের স্বরচিত জীবন চরিত আমার জীবনীর[১] একটি পূর্ণাংগ বর্ণনা প্রকাশ করা। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়ে সতর্ক পাঠকের বিচারাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় পরিচয় যথেষ্টরূপে পরিতৃপ্তিকর বা নিরন্ধ্র হোতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। মীর সাহেবের বইটি বিপুল। পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৫। তার ওপর আত্মকাহিনীর মধ্যে জগতের যাবতীয় বস্তু ও তত্ত্বের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে বোলে সকল অংশ সমান প্রাসংগিকতার সূত্রে পরস্পরের সংগে সুগ্রথিত নয়। বইটি তাড়াতাড়ি পোড়বার সময়[২] এবং টুকে নেবার জন্যে অংশ বাছাই করার কালে আমার ব্যক্তিমানসের নানা প্রবণতা যে আমার মনোযোগকে পরিচালিত করে নি এমন কথাও বোলতে পারি না। তবুও মূলের পরিচয়কে যথাসম্ভব অস্পর্শিত বিশুদ্ধতায় উপস্থিত কোরতে প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনার দ্বারা যে অন্তরাল সৃষ্টি করেছি তার অপনোদনের জন্যে প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্টে মূল বইয়ের এক সুবৃহৎ অংশ পৃষ্ঠানুক্রমিক ধরাবাহিকতা বজায় রেখে অবিকল তুলে দিয়েছি।

বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মীর সাহেবের আমার জীবনীর একটি বিস্তৃত পশ্চাদপট ও ভূমিকা রচনার অজুহাতে বাংলা ভাষায় রচিত আত্মচরিত সমূহের একটি বর্ণনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করা।

দুই

আত্মকথার ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'আমি বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তাঁর কাগজে আত্মকথা যে কেন লিখিনি, তার একটা নাতিহ্রস্ব কৈফিয়ৎ প্রকাশ করি। তাতে যতদূর মনে পড়ে প্রথমে বলি যে, বাংলা সাহিত্যে আত্মকথা লেখার রেওয়াজ নেই।'[৩] রবীন্দ্রনাথ, নবীন সেন এবং ঢাকা জেলার

জনৈক ব্রাহ্মণকন্যা লিখিত আত্মজীবনীত্রয় ছাড়া বাংলা ভাষায় এই সাহিত্য-রূপের অন্য নজীর তিনি অনায়াসে মনে কোরতে পারেন নি। এবং আত্মচরিতে প্রত্যাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও রস যে এগুলোর মধ্যে স্পষ্টতই উপেক্ষিত হোয়েছে একথাও তিনি না বোলে ছাড়েন নি।

প্রমথ চৌধুরীর এ অভিমত রহস্যচ্ছলে উচ্চারিত হোলেও এর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসটি অমনোযোগ ও অসতর্কতা পুষ্ট। 'আমাদের নব্য বংগ সাহিত্যের নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শক' বংকিম তাঁর আত্মজীবনী লেখেন নি এটা সত্য। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সুরু কোরে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত, বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় উদ্যোগী বংগদেশীয় প্রায় প্রত্যেক মনীষীই তাঁদের নিজেদের জীবন কাহিনী লিখে রেখে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোনোটা আয়তনে বিরাট, কোনোটা সংক্ষিপ্ত। কেউ হয়তো আত্মমানসের বিচিত্র বিবর্তনের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন, কেউ কর্মযোগী সমাজিকের দৃষ্টি নিয়ে পরিচিত পরিবার ও পরিবেশের বিশদ চিত্র তার সংগে যুক্ত কোরেছেন। নিজে লেখেন নি, কিন্তু নিজের জবানীতে অন্যের লেখার মধ্যে আত্মপরিচয় প্রকাশ কোরেছেন এমন চরিত্রও একাধিক। আমাদের নির্দিষ্ট কালগণ্ডির মধ্যে সেরকম একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হোলো পুরাতন প্রসংগ।[৪] এই বইয়ের লেখক বিপিন বিহারী গুপ্ত, আত্মকাহিনীর কথক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। আরেকটি বইয়ের নাম বিদ্রোহে বাংগালী।[৫] কথা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু সেগুলো গুছিয়ে লিখতে সাহায্য কোরেছেন বা লিখে দিয়েছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। উভয় গ্রন্থকেই আমাদের আলোচ্য তালিকার এখতিয়ারভুক্ত কোরে নিয়েছি। আত্মবর্ণিত একক চরিত্রের আখ্যান না হোলেও একাধিক আত্মজীবনীর সংকলন হিসেবে বংগভাষার লেখক[৬] মূল্যবান বই। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতাপুত্র' এই সংকলনের দীর্ঘতম ও সার্থকতম রচনা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের জীবনের নানা কথা এই গ্রন্থে বিবৃত কোরেছেন। তবে রচনাগুলো আয়তনে ও আবেদনে পূর্ণাংগ আত্মজীবনীর সংগে একাসন পেতে পারে না বোলে বইটির উল্লেখ মাত্র কোরে ক্ষান্ত হোলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সুরু কোরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী প্রকাশের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। রাসসুন্দরী দাসী[৮], ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[৮], দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়[৯], মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১০], রাজনারায়ণ বসু[১১], নবীন সেন[১২], মীর মশাররফ হোসেন[১৩], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৪], সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৫], শিবনাথ শাস্ত্রী[১৬],— এঁদের আত্মজীবনী সমূহ এই সংকীর্ণ কালের মধ্যে ছাপা হয়। ১৯১৮র পরে প্রকাশিত গ্রন্থাদি আমাদের প্রবন্ধে আলোচিত হয় নি।

তিন

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি আপাত দৃষ্টিতে দুমুখো মনে হলেও, সিদ্ধান্তটি দ্বিধাহীন এবং আত্মজীবনীর প্রত্যাশিত শিল্পরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় পরিপুষ্ট। 'এ বই অতি চমৎকার বই।.....কিন্তু এও রবীন্দ্রনাথের জীবন চরিত্র নয়. তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। যদিচ এর মধ্যে তাঁর বাল্যজীবনের মালমশলা অনেক পাওয়া যায়।'[১৭] কবির 'জীবন দেবতা' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গভাষার লেখক-এ।[১৮] সেখানেও নিজের লৌকিক জীবনাংশ বা শৈল্পিক সত্তার ইতিবৃত্ত কোনোটা রচনা করাই হয়তো কবির লক্ষ্য ছিলনা। যা অভিপ্রেত ছিল তার সত্যতা সম্পর্কেও সমসাময়িক রবীন্দ্রবিদ্বেষী পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালের ঘোর সংশয় ছিল।[১৯] আত্মজীবনী মূলক রচনা হিসেবে, জীবনী হিসেবে এবং রচনা হিসেবে জীবনস্মৃতির ত্রিমাত্রিক বিচার প্রাসংগিক হোলেও তা বর্তমান প্রবন্ধের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ও আয়তন অনুমোদিত নয়। অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত ক্বচিতপঠিত বাংলা আত্মজীবনী সমূহের তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা বিশেষ কোরে সে সকল আত্মজীবনীর আলোচনাতেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ কোরেছি যে গুলো উনিশ শতকের বাংগালীর বিশিষ্ট চিন্তা ও চরিত্র, চাল ও মেজাজকে চিত্রিত কোরেছে।

চার

কালানুক্রমিক বিচারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসীর আমার জীবন, কলিকাতা, বাং ১২৭৫ [ইং ১৮৬৮]। প্রমথ চৌধুরী যে জনৈক পূর্ববংগীয় মহিলার আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ কোরেছেন, এইটেই যে সেই গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই বইয়ের যে গভীর কৌতুকজনক দৃশ্যটি তিনি দীর্ঘ কাল পরেও ভুলে যেতে পারেন নি সেটা সুকুমার সেন বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত কোরেছেন[২০]:

> ঐ বাড়ীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্ত্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ, দেখ! ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ! আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম।... বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত, আমি ঘোড়া দেখিয়া ভয়ে পলাইতাম। এ কথা আমি লজ্জায় কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। [রাসসুন্দরী, আমার জীবন, ৩য় সং ১৩১৩, পৃঃ ৫৬—৫৮]

সম্প্রতি বইটি একটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হোয়েছে বলে শুনেছি, এখনও দেখবার সুযোগ পাই নি। সুকুমার সেনের মতে 'মনের কথার এমন সহজ ও নিরাভরণ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।' 'ভক্ত বৈষ্ণব গৃহের কন্যা লেখিকার ভগবৎপরায়ণ চিত্তের পরিচয় বইটিতে দীপ্যমান' এবং 'যে কালে পুথি পড়িলে বিধবা হয় এই সংস্কার প্রবল ছিল সে কালের গৃহস্থবধূ হইয়া রাসসুন্দরী কিরূপ অদম্য জ্ঞানপিপাসা লইয়া ও বৃহৎ সংসারের ভারগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে পুথি ও পরে ছাপা বই পড়িতে এবং আরো পরে লিখিতে শিখিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়াবহ।'[২১]

গ্রন্থটি যে সত্যি স্বরচিত তার আন্তর প্রমাণ হিসেবে সুকুমার সেন লেখিকার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন।

পাঁচ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর-চরিত'। স্বরচিত, কলিকাতা, ১৮৯১॥

সন-তারিখ বিচারে বিদ্যাসাগরের রচনাটি হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম নয়, দ্বিতীয় আত্মচরিত। কিন্তু আত্মজীবনীর শিল্পমূল্যের কথা স্মরণ রেখে বিচার কোরতে বসলে স্বীকার কোরতেই হবে যে বাংলায় সার্থক আত্মজীবনী-মূলক রচনার সূচনা বিদ্যাসাগর থেকে। এমনকি এরকম মনে করাও অসংগত হবে না যে, যদি বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ করে যেতে পারতেন তা'হলে হয়তো এই বইটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী বলে ইতিহাসে স্থায়ী মর্যাদা লাভ কোরতো।

বইটির প্রথম গুণ তার ভাষা। যে বিদ্যাসাগর গতানুগতিক ধারণায় বাংলা গদ্যের বিবর্তনে 'পণ্ডিতী রীতির' শ্রেষ্ঠ লেখক বোলে সম্মানিত সে বিদ্যাসাগরই যে আত্মপ্রকাশের অনিবার্য শিল্পানুভূতি নিয়ে ভাষাকে কি সরল এবং সবল অন্তরঙ্গ কলারূপ দান কোরতে সক্ষম ছিলেন তার পরিচয় মিলবে এইখানে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিরাট পুরুষের মানস কোন উপাদানে গঠিত, কোন পরিবেশে বর্ধিত, কোন ঘটনারাশির দ্বারা সংক্রামিত তার আদিকথা এখানে বলা হোয়েছে দুর্লভ সরসতার সংগে। যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি সে কাহিনীর নানা অংশ চয়ন কোরেছেন, যে নিপুণতার সংগে সেগুলো বর্ণনা কোরেছেন, আত্মসত্তার যে পূর্ণতাবোধ নিয়ে তাকে সূত্রাকারে গেঁথেছেন তা স্বল্পায়তন হলেও আত্ম-জীবনীর পরিণত শিল্পরূপের দ্যোতক।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থটিতে 'তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ আছে।'[২২] সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সে আলেখ্য ঈশ্বর-চরিতের তাৎপর্য নির্দেশে এবং মর্মোদ্ঘাটনে যেমন সরস তেমনি গভীর। কুশলী কাহিনীকারের মতো সত্যকে উপাখ্যানরূপ দান করেছেন এবং তার দ্যুতিতে আলোকিত কোরে তুলেছেন নিজের সত্তার এক একটা দিককে। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠায় আছেঃ 'জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল, আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত [এক গুঁইয়া] লক্ষণ আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।' বিদ্যাসাগরের

তেজোময় স্বভাবের পরিচিত পিঠের অপরপার্শ্বে যে একটি হাস্যময় উদার পুরুষ অংগাংগীভাবে বিরাজমান ছিল এই উক্তি তার সংকেতবাহী। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই মনোমুগ্ধকর দ্বৈত ধর্ম যেন পিতামহদেব রামজয় তর্কভূষণের আদলে গঠিত।[২৩] উভয় চরিত্রের এই সাযুজ্যের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অঙ্গুলি নির্দেশ, পূর্ব-পুরুষের গতানুগতিক বিবরণকেও আত্মজীবনী-সংগত শিল্প-মর্যাদা দান কোরছে। এই রীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত আছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সামান্য অভিজ্ঞতার খোশ গল্প, ব্যক্তিসত্তার অন্তরংগ বৈশিষ্ট্যের সংগে যুক্ত হোয়ে, তুচ্ছ কাহিনীর অভিঘাতকে মহনীয় কোরে তুলেছে :

> আমি স্ত্রীজাতীর পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। [৪৭০ পৃঃ]

বিদ্যাসাগর চরিতের অচরিতার্থতার প্রধান কারণ তার অসংগত অসম্পূর্ণতা। কিন্তু ব্যক্তিসত্তার অন্তরংগ পরিচয় জ্ঞাপনে তিনি যে কলারীতির প্রবর্তন করেন, জীবন-চরিতে স্মৃতিসিঞ্চিত বিচিত্র খণ্ড কাহিনী ও বিবিধ পার্শ্ব চরিত্র সৃজনের যে সম্ভাবনাকে তিনি উন্মোচিত কোরে দেন, পরবর্তীকালে কীর্তিমান আত্মচরিতকার মাত্রেই তার উত্তরাধিকারে উপকৃত হোয়েছেন। এই ধারার উত্তরসূরীদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রেষ্ঠ।[২৪]

ছয়

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, আত্মজীবন চরিত, কলিকাতা, ১৩০৩॥

দেওয়ানজীর রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায়। প্রকাশকালের সাহিত্য-সম্পাদক এই বইয়ের দুটো গুণের কথা বিশেষ কোরে উল্লেখ করেন। এক, 'দেওয়ানজী নিজগুণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন, তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিত যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' দুই, 'ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।' আদর্শ আত্মজীবনীতে আমরা প্রকারান্তরে

এই দুই গুণেরই মিলিত কারুকার্য কামনা করি। ব্যক্তিচরিত্রের প্রকাশ দেখতে চাই অন্তরঙ্গ সুহৃদের দৃষ্টি দিয়ে; সে ব্যক্তিত্বের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার সকল রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম কোরতে চাই নিঃশেষে। সে সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও উপলব্ধি কোরতে চাই যে একটি মূল্যবান চরিত্র আগাগোড়া আকস্মিক নয়, সে ইতিহাসের ধারায় বিধৃত, সমাজে প্রতিপালিত, পরিবারে পরিবেষ্টিত। তাঁর অন্দরের আনন্দ এবং সদরের কোলাহল দুইই আমরা জানতে চাই, চিনে নিতে চাই। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম আত্মজীবনীর এই পরিপুষ্ট রসরূপকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেন। তবে তাঁর রচনাটি অসম্পূর্ণ এই অর্থে দেওয়ানজীর আত্মজীবন চরিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সার্থক আত্মজীবনী। সার্থক কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে। কারণ এই বইতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় যে রূপ উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনা মূলক, প্রচার-উন্মুখ, আদর্শায়িত এবং খণ্ডিত। নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বোলেছেন:

> প্রাক্ রবীন্দ্র বাংলা আত্মজীবনী ইতিহাসে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বা উদ্দেশ্যে বড় স্পষ্ট। সেগুলিতে আত্ম প্রতারণার ভাব কতখানি আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অহমিকাটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার সপক্ষে কোন আত্মচরিতখানি না আসিয়া দাঁড়ায়![২৫]

দেওয়ানজীও ব্যতিক্রম নন। তিনিও তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে ব্যক্ত করার নামে কার্যত 'কামজয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন'। একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যাক।

> আমার স্বভাবের জন্যই হউক, বা আকারের জন্যই হউক, কি স্বরের জন্যই হউক অথবা এই সকল কারণের সমষ্টিতে হউক, আমাকে স্ত্রী লোকেরা নিরতিশয় ভালবাসিতেন। এমন কি, শুনিয়াছি বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় আপনাদের মধ্যে বলা কহা করিত। আমার বোধ যে, আমার স্বরের গুণেই কামিনিকুল আমাকে এত ভালবাসিতেন।
>
> বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথাই মনে পড়ে। এককথা শেষ করিলে আর এককথা স্মৃতিপথে আইসে হৃদয়ের কত পবিত্রতা ছিল। কোন দুষণীয় ভাবই মনোমধ্যে স্থান পাইতনা। মিত্রতার সহিত কিছুমাত্র স্বার্থপরতা ছিলনা। প্রেমের সহিত কিছুমাত্র অপবিত্রতা মিশিত না। চিত্তের সকল ভাবই যেমন নির্ম্মল রসে পূর্ণ থাকিত। বন্ধুতা ও প্রেমের একই ভাব ছিল। যে কামিনীর মোহিনীর মূর্ত্তি দিনযামিনী হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল। সে মূর্ত্তিকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা হইতনা। দৈবাত স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপবিত্র ভাবের

আবির্ভাব হইত না। দর্শন স্পর্শন উভয়েতেই পবিত্রভাব ছিল। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনর বৎসর। এ দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে নিন্দার ভয়ে তিনি আমার সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে অন্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। [পৃঃ ৪১-৪২]

এই প্রণয় কাহিনীর পরবর্তী অস্বস্তিকর পরিণতি ব্যাখ্যা কোরে চরিতকার বলছেন 'বোধ হয়, তাঁহার দুশ্চরিত্রা দাসীর কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায়, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্র ভাবের উদয় হইল'। [পৃঃ ৪৫] এই স্মৃতিমন্থনের মধ্যে আত্মগৌরব ঘোষণার যে প্রবণতা মিশ্রিত ছিল তা কাহিনী-শেষের সরল আত্মপ্রসাদজনিত বাণীর মধ্যে অসংকোচ প্রকাশ লাভ কোরেছে :

আমার সেই বয়সে সেই সময়ে, আমি যে এই প্রলোভন দমনে সমর্থ হইয়া পাপ পংকে পতিত হইনাই, ইহা অদ্যপি স্মরণ করিলে মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়। [পৃঃ ৪৬]

যখন দেওয়ানজীর ৩০ কি ৩২ বৎসর বয়স তখনও একবার চতুর্দশ বর্ষীয়া এক সুশ্রী গায়িকা তার প্রতি আসক্ত হন। সে প্রলোভন থেকে মুক্তিলাভের প্রক্রিয়াও ১১০ থকে ১১২ পৃষ্ঠায় উক্ত আছে।

দেওয়ানজীর বইয়ের আসল মূল্য অন্দর নয়, সদর এলাকার প্রণবন্ত আলোচনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের মহানগরীর জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর এমন সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। বিবরণ দানের বিষয় চয়নে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সম্পর্কবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা পরিণত সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষেও গৌরবের বস্তু হোতো।

দেওয়ানজীর আমলে নবীন শিক্ষার্থীগণ ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় বিশেষ রূপে মগ্ন থাকতেন। বলা উচিত, সে শ্রমে প্রাণপাত কোরতেন। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় তৎকালীন সে শিক্ষাপ্রণালী খুঁটিয়ে বর্ণনা কোরেছেন, পাঠ্য পুস্তক সমূহের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, গুরু মহাশয়ের অমানুষিক জুলুমের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন, ফারসী পুথির অর্থ বালকের নিকট দুর্বোধ্য উর্দু ভাষার ব্যাখ্যা করা হোতো বলে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ কোরেছেন। দেওয়ানজীর বক্তব্য :

অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারম্ভ হয়। [পৃঃ ৮]

প্রথমে আমরা সেখ মসলার্দ্দন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশ-পুস্তক) নামে নীতিগর্ভ পদ্যপুস্তক একখানি পাঠ করি। এখানি অতি ক্ষুদ্র ও অতি

সরল ভাষায় লিখিত।... এই সকল উপদেশ অতি সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় পারস্য বালকবৃন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। এইরূপ সরল ভাষায় রচিত বাংলা ভাষায় পুস্তক যেরূপ বঙ্গীয় বালকের বোধগম্য হয়, সেইরূপ এই পন্দনামা পারস্য বালকগণের বোধগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় বালকের এই পুস্তিকার অর্থ কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ও তাহার পাঠেই বা কি লাভ হইবে; কারণ তৎকালে কোন পারস্য পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দনামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না, কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। যদি এই পুস্তিকা বাংলা অর্থের সহিত পড়ান হইত, তাহা হইলে বালকেরা অবশ্যই কিছু উপকার পাইত।

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে ঐ সাদীর বিরচিত গোলস্তাঁ। অর্থাৎ গোলাপ ফুল কানন নামে গ্রন্থের পাঠারম্ভ হয়। এইখানি গদ্যে পদ্যে রচিত এবং অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে সত্য অসত্য নানাবিধ গল্পে বিবিধ প্রকার সুনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। [পৃঃ ১২] প্রথমে আমরা এই গ্রন্থেরও আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে এক অধ্যায় পাঠ করিলে, পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ্দু ভাষায় ইহার অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। দুই অধ্যায় পঠিত হইলে ঐ গ্রন্থ-কর্ত্তার বিরচিত বুস্তাঁ (সৌরভাধার) নামে একখানি নীতিসার পদ্যপুস্তকের পাঠারম্ভ হয়। [পৃঃ ১৪]

গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ, উভয় গ্রন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণী পাঠোপযোগী, তথাপি এই দুই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ম করাইতে পারিলে বালকদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতি শিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পারস্যের ন্যায় উর্দ্দু ভাষাও বালকের বোধগম্য হইত না। যাহা হউক তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উর্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তুষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের সুনীতি শিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাঁহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন। [পৃঃ ১৫]

এবং কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই—

মাতুল মহাশয় প্রথমে আমাকে ইয়ার মহম্মদ আলমগীর, সেকন্দর নামা এবং মিজান অধ্যয়ন করিতে দেন। এই সকল পুস্তকের কতকাংশ পঠিত

হইলে ক্রমশঃ বাহার দানেশ, আল্লাসি জহুরি, আসফি উবুক্তি জাহির, হাফেজ এবং মোনশব এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত করেন। [পৃঃ ২২]

এই ছিল পোড়বার বিষয় এবং পড়াবার রীতি। যাঁরা পড়াতেন তাঁদের সম্পর্কে দেওয়ানজীর দ্ব্যর্থহীন অভিমত ঃ

গুরু মহাশয় ও ওস্তাদজি, উভয়েই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন। পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঙ্কবিদ্যা শিখাইবার রীতি ছিল। মকতবেও তেমনই বালবুদ্ধির অগম্য পুস্তক সকল ব্যবহৃত হইত। উভয় স্থলেই ছাত্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় বিস্মৃত হইলে অতি নির্দ্দয়রূপে তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে তাহাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরুজন বিবেচনা করিতেন এবং কেবলমাত্র পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। যে লেখা-পড়ার জন্য ইদানীন্তন শিশুগণ পর্যন্ত আগ্রহ করে, শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২।১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত্যাগ করিবার ও অন্ধ হইবার বাঞ্ছা করিত। [পৃঃ ২০]

এত কষ্ট স্বীকার কোরে ফারসী আয়ত্ত করার পর শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই যেদিন অকস্মাৎ ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে আদালতের ভাষা রূপে গ্রহণ কোরতে বাধ্য হোলো সেদিন কেবল মুসলমান নয়, অনেক উচ্চ হিন্দুও কঠিন মুসিবতের মধ্যে পোড়লেন। ইংরেজীর খড়্গাঘাত সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা যে অংশত হলেও সংশোধনযোগ্য দেওয়ানজীর জবানবন্দী তার স্মারক। আদালতে ইংরেজীর প্রচলন হওয়াতে ;

(বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য) একরূপ অকর্ম্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে অথবা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে কিছু শিখিয়া ছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্মূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যা শিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।

স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে বালকদের সংগে পড়িতে হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্ররূপে পড়িতে লাগিলাম। [পৃঃ ৩৪]

যখন পারস্যভাষা রাজকার্যে অব্যবহৃত হয় তখন আমি টেলিমেকাস ওক্যাম্বেলের প্লেজারস্ অব্ হোপ পড়িতেছিলাম। রীতিমত না পড়িলে এ সখের পাঠে বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া উক্ত দুই পুস্তক ছাড়িয়া দিলাম, এবং নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম, এবং এক বৎসরের মধ্যে তিনখানি রিডর ও একখানি গ্রামার পড়িলাম। স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে লজ্জাত্যাগ পূর্ব্বক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, এবং কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। [পৃঃ ৩৫]

...আর ইংরাজী বিদ্যার প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং ইংরাজী রীতিনীতির অনুকরণে বিশেষ স্পৃহা হইল। আমাদের বাহ্যে বিশেষপরিবর্তন হউক না হউক, অন্তরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিল। [পৃঃ ৩৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সঙ্গে শেষার্ধের তুলনা করে বোলেছেন ঃ

কোন কোন বিষয়ে তদানীন্তন লোকের আচরণ দেবতার ন্যায় প্রশংসনীয় ছিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্র প্রেতের ন্যায় দূষণীয় দৃষ্ট হইত। দেব-ভক্তি, পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃভগিনী স্নেহ, প্রতিবাসী ভালবাসা, অতিথি সৎকার, দান, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ বিষয়ে তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আবার মিথ্যা কথন, উৎকোচ গ্রহণ, ইন্দ্রিয় দোষ ইত্যাদি দোষাবহ বিষয় সকল তাঁহাদের বিবেচনায় যৎসামান্য পাপ বলিয়া বোধ হইত। [পৃঃ ১৫]

প্রসঙ্গক্রমে বংগদেশীয় গণিকালয়ের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য কোরেছেন আজকের দিনের পাঠকের জন্য সেগুলো রীতিমতো শিহরণমূলক এবং দৃষ্টি উন্মোচনকারী ঃ

এ প্রদেশে বেশ্যাগমন অতীব অধর্ম বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এমনকি গণিকালয়ে প্রবেশকালে প্রবেশকের সঞ্চিত পূণ্যসমূহ বহির্দ্বারে রাখিয়া যাইতে হয় এবং তজ্জন্য সেই বহির্দ্বারের ভূমি পূণ্যস্থান বলিয়া তাহার মৃত্তিকা দুর্গাপূজার মহাস্নানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই কারণেই প্রাচীনদিগের প্রায় কোন ব্যক্তিকে বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিতে দৃষ্ট হইত না।

কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনা বাজারে বেশ্যালয় ছিল। গোয়াড়ীতে কয়েক ঘর গোপ ও মালো গাঁড়ার ও অন্যান্য নীচ জাতির বসতি ছিল। পরে

যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদী তীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয়, সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবেরা গোয়াড়ীতে পশ্চিম দিকে, ও তাঁহাদের আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা ইহার পূর্ব দিকে, আপন আপন বাসস্থান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা-দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।

[পৃঃ ৩৭]

সবার শেষে আর একটি উদ্ধৃতি। তাঁর বাল্যকালে দেখা কলিকাতার চিত্র, চিত্র হিসেবে অংশটি অবিস্মরণীয়।

একালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ ছিল না। বিশেষতঃ দেশীয় নগরবাসীদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থ্যজনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের প্রায় সমস্ত বর্ত্মের পার্শ্বস্থপ্রণালীর মলযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প সর্ব্বদা উত্থিত হইত। অভ্যাস বশতঃ অধিবাসিদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট হইত না, কিন্তু বাহিরের লোকের এ সকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইত! এমন কি, নাসিকা দ্বার বন্ধ করিয়া চলিতে হইত। রাত্রিতে কোনরূপ আলোক সংগে না থাকিলে গলি রাস্তায় অন্ধের ন্যায় চলিতে হইত, এবং পুলিশের সুনিয়ম অভাবে দস্যুভয়ে অনেক গলিতে যাইতেও সাহস হইত না। শুনা যাইত যে, তস্করেরা কৃত্রিম মত্ততা প্রকাশ করিয়া পথিকের গাত্রে পড়িত, এবং তাহার শাল বা ঘড়ি লইয়া পলায়ন করিত।

জাহ্নবী তীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহু লোক তথায় নিরন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও এতাদৃশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল যে তাহাতে গংগার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও, তাহাতে প্রফুল্লচিত্তে অবগাহন করা যাইত না।

[পৃঃ ৫৫]

সাত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ ইং ১৯২৭, (১ম সংস্করণ ইং ১৮৯৮ ২য় সংস্করণ ইং ১৯১১) ॥

আমাদের আলোচ্য তালিকার এটি চতুর্থ আত্মচরিত। বাংলা ভাষায় রচিত এইটেই প্রথম দীর্ঘ আত্মজীবনী যার বিষয় বস্তুর গৌরব রচনার শিল্পকলার কৃতিত্বের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নয়। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন বর্ত্তমান ভারতের পরম গৌরবের বস্তু।' [তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদনের প্রথম বাক্য] আত্মজীবনী পাঠ কোরে আমরা যে জ্ঞানমূলক কৌতূহল নিবৃত্ত কোরতে চাই, যে আনন্দের স্বাদ লাভ কোরতে উদ্যোগী হই, তার কারণও হোলো বর্ণিত ব্যক্তি চরিত্রের ইতিহাসস্বীকৃত মহিমা সম্পর্কে পাঠকের এই পূর্বস্মৃতি।

মহর্ষি-রচিত আত্মজীবনীর তৃতীয় সংস্করণটি সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। বিষয়সূচী, নামসূচী, বংশতালিকা, কয়েক শত পাদটীকার অত্যন্ত প্রাসংগিক তথ্যবহুল মন্তব্য এবং সর্বোপরী গ্রন্থশেষের সুদীর্ঘ [৩৯৯ থেকে ৪৬৫ পৃষ্ঠা] পরিশিষ্টটি গ্রন্থের মূল বিষয়ের প্রতি সম্পাদকের গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত সত্যানুন্ধানী দৃষ্টির উজ্জ্বল সাক্ষী। মুদ্রন পারিপাট্যেও এই সংস্করণ অসাধারণ মৌলিকতার অধিকারী। প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে পরিচ্ছেদ সংখ্যা, ঘটনার বৎসর, মহর্ষির বয়স এবং সেই পৃষ্ঠার বক্তব্যের সংকেত দেয়া রোয়েছে। পাঠকের চেতনাকে তা প্রতি পংক্তিতে বহুমুখে প্রসারিত কোরে দিয়ে মৃত অতীতকে সারাক্ষণ মুখর কোরে রাখে। যাঁদের কথা আত্মজীবনীতে চকিতে উল্লেখ করা হোয়েছে, যে সকল গ্রন্থের প্রভাবের প্রতি মহর্ষি ইংগিত মাত্র কোরেছেন, যে সব তত্ত্বচিন্তা অন্দোলন ও সংগঠনের কথা মহর্ষি ব্যক্তি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত কোরেছেন, পরিশিষ্টে সে সম্পর্কিত যাবতীয় প্রামাণ্য তথ্যপুঞ্জ বিস্তৃত আকারে বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে সংকলিত হোয়েছে। পরিশিষ্টটি যে এত মূল্যবান হোতে পেরেছে তার একটি কারণ, মহর্ষির প্রকৃত জগত ও জীবন ইতিহাসের বিচারেও বিশেষ মূল্যবান ছিল। মীর সাহেবের আমার জীবনী বা এ শ্রেণীর অন্যান্য রচনার একটি কোরে তথ্যকণ্টকিত, টীকা পরিশিষ্ট সম্বলিত, নয়া সংস্করণ [উদ্যমশীল গবেষক সম্পাদক দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হোলেও সে শ্রম কতখানি আত্যন্তিক মূল্যে গরীয়ান হোয়ে উঠবে বলা কঠিন। তবুও ওরকম]

সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রোয়েছে। মহর্ষির আত্মজীবনী সম্পর্কে পর্যন্ত সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বোলতে বাধ্য হোয়েছেন "আমি যখন এই গ্রন্থ-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমার ধারণা ছিল যে মহর্ষির লেখাতে কোথাও ভুল নাই।...কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, মহর্ষিদেব আত্মজীবনী লিখাইবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার উক্তিতে ভুল রহিয়াছে।" [৩য় সং, সম্পাদকের নিবেদন, ॥/০] কারণ যাই থাকুক মহর্ষিও কিছু ভুল কথা লিখেছেন। সে বিচ্যুতি যে মীর সাহেবের রচনাতেও অদৃশ্য কীটের মতো প্রবেশ কোরতে সমর্থ হোয়েছে তা বলা বাহুল্য। তাই শুদ্ধমাত্র মীর সাহেবের জবানবন্দীকে সম্বল করে আমরা যদি তাঁর একটি জীবনচিত্র আঁকি তবে তা প্রামাণ্য বা পূর্ণাংগ বলে গৃহীত হবে না। সে কাজ করার আগে আমাদেরকেও মুক্তদৃষ্টি নিয়ে, সকলরকম বিরোধী অবিরোধী প্রমাণাদি একত্রিত কোরে মীর সাহেবের নিজ মুখে বলা কথারও সত্যা-সত্য বিচারে প্রবৃত্ত হোতে হবে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে অকিঞ্চিৎকর রচনা শৈলিকে আশ্রয় কোরে নিজের জীবনের মহৎ ভাব ও মহৎ কীর্তিসমূহের ফিরিস্তি প্রদান কোরেছেন মাত্র, একথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। দেবেন্দ্রনাথের গদ্যে এমন এক বিশেষ সরলতা ও সরসতা ছিল যার তুলনা বাংলা গদ্য নির্মাণের কৈশোর কালে ত বটেই, আজও দুর্লভ। দেবেন্দ্রনাথের গদ্য আটপৌরে হোলেও স্বমানসের আদলকে অন্তরংগ-রূপে ফুটিয়ে তুলতে অনেকাংশে সক্ষম। বিদ্যাসাগরের কালবৃত্তে রচিত হোয়েও দেবেন্দ্রনাথের নিরলংকৃত গদ্য স্বগুণে প্রাণস্পর্শী। তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবের বর্ণনা, মহর্ষির ভাষায় ঃ

> আমরা এদিকে সারাদিন ব্যস্ত। কেমন করিয়া সভার ঘর ভাল সাজান হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ করিবেন, তাহারই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আমরা আলো জ্বালিয়া, সভা সাজাইয়া, সব ঠিকঠাক করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এই নিমন্ত্রণে কি কেহ আসিবেন? দেখি যে, সন্ধ্যার পরেই লণ্ঠন আগে করিয়া এক একটি লোক আসিতেছেন। আমরা সকলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভার সম্মুখের বাগানে, বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া বাগান ভরিয়া গেল। লোক দেখিয়া আমাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। ... রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদে পড়িতে লাগিলেন। বেদ

> পাঠ শেষ হইতেই রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি উঠিয়া বক্তৃতা করিলাম। ... আমার বক্তৃতার পর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য বক্তৃতা করিলেন, তাহার পর চন্দ্রনাথ রায়, তাহার পর উমেশচন্দ্র রায়, তৎপরে প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, তদনন্তর অক্ষয়কুমার দত্ত, পরিশেষে রমাপ্রসাদ রায়। ইহাতে রাত্রি প্রায় ১২ টা বাজিয়া গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২ টা বাজিয়া গেল। লোকগুলান্ হয়রান! সকলেই অফিসের ফেরতা। হয়ত কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি আমার ভয়ে কেহ সভা ভঙ্গের আগে যাইতে পারিতেছে না। কেহই বা কি বুঝিল, কেহই বা কি শুনিল, কিছুই না! কিন্তু সভাটা ভারী জাঁকের সহিত শেষ হইল। [পৃঃ ৬৯—৭০]

'তিনিই বাংলায় ভাবুকতা ধারার গদ্য, (Refletive Prose) প্রথম রচনা করেন, আর সে ধারায় তাঁর তুলনা নেই। [১৬] দেবেন্দ্রনাথের বাণীর এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর উক্তি স্মরণীয়। 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তোলে এবং মনচশ্চক্ষুকে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।' মহর্ষির অন্তর্লোকের উৎকণ্ঠা এই ভাষায় কী মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করে তার একটি বিখ্যাত নজীর হোলো এই অবিস্মরণীয় পংক্তি কটি ঃ

> তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তন ভূমি হইল না। উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি, আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহন করিতে পারিনা। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ্, তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।

মহর্ষির চরিত্রেরও এইটেই পরম রমণীয় দিক। তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তের, সংস্কার রক্ষনশীলের, চিত্ত যুক্তিবাদীর। হৃদয়ে অনুমিত সত্য যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সর্বান্তঃকরণে তা গ্রহণ কোরতে পারতেন না। না পারার ক্ষোভে অশান্তি ও অস্থিরতা অনুভব কোরতেন। তারপর বিবুদ্ধ সত্য যুক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হওয়া মাত্র নিজের প্রাচীনতম সংস্কার ও অতিপ্রতীত বিশ্বাসরাশিকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত

বাংগালীর যে নবজাগ্রত চেতনা ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনকে আশ্রয় কোরে বুদ্ধির মুক্তি কামনা কোরেছিল, মহর্ষিই তার গোড়াপত্তন করেন। এই বিচারে অপেক্ষাকৃত আপোষহীন যুক্তিবাদি অক্ষয়কুমার মহর্ষির শিষ্য ও সহকর্মী, গুরু বা অরি নয়।[২১]

কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত রচনা কোরতে বসে মহর্ষি, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রসংগে বোলেছেন :

> পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর, আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।
>
> ফলতঃ ইহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ,—আকাশ পাতাল প্রভেদ!
>
> [পৃঃ ৭৫—৭৬]

দশ বছর শ্রমের পর পিতৃ ঋণের মহাভার যখন কিছুটা লাঘব হোয়েছে তখনই 'কিন্তু আরেক প্রকার, নূতন বিপদভার, ঋণভার, আমাকে জড়াইতে লাগিল।' [পৃঃ ২১৮] পিতৃ ঋণের সঙ্গে গিরীন্দ্রনাথের ঋণও মহর্ষি অংশত পরিশোধ কোরে আসছিলেন, এখন তার সঙ্গে এসে যুক্ত হোলো নগেন্দ্রনাথের ঋণ। সে সময়ে নিজের মর্মচেতনায়, সত্যদৃষ্টির দিব্য জ্যোতি লাভ কোরতে না পেরে তিনি এক গভীর অস্থিরতা ও অশান্তি অনুভব কোরছিলেন, তার ওপর অন্যকৃত পরিশোধ্য ঋণের এই বিরামহীন খড়্গাঘাতে

> মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেল। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিলে এইরূপ নানা উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং ক্রমে আবার ঋণজালে বদ্ধ হইতে হইবে। অতএব আমিও বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না। ওদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয় সভা' বাহির করিলেন, তাহাতে হাত

তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ কি না?' যাহার যাহার আনন্দ স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপ অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত। এখন যাঁহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মাভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল। [পৃঃ ২১৯—২২০]

একটু পর শান্তির স্পর্শ লাভ কোরছেন তাঁর প্রিয় কবি হাফিজের কাব্য স্মরণ কোরে। মহর্ষির অধ্যাত্ম জীবনের কাহিনী এমনি কোরে বাস্তব জীবনের সংকটকে, ব্যক্তি চেতনার বিক্ষোভকে মূর্ত কোরে তুলেছে। পাঠশেষে যাঁর সাক্ষাৎ নিজ হৃদয়ে লাভ করি তিনি সৌম্য দর্শন প্রেমময় পুরুষ, যাঁর ভাবুকতা দরদভরা, যিনি একাধারে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী এবং কাব্যরস পিপাসু। মহর্ষির মধ্যে স্মিতরসের বা কৌতুক বোধের লেশমাত্র ছিল না এমন আশঙ্কা করাও ভুল। কোনো কোনে বর্ণনায় নিজের গভীরতম সংস্কার এবং প্রখরতম স্বচ্ছ দৃষ্টি উভয়কেই তিনি সরসভাবে ব্যক্ত কোরেছেন। যেমন [পৃঃ ২০০—২০৪] পুরীতে নিরাকার জগন্নাথ দর্শনের চিত্রটি :

"স্নান করিয়া উঠিয়াছি, জগন্নাথের একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি অমনি তাহার সঙ্গে সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলাম। আমার পায়ে জুতা ছিল না, তাহাতে পাণ্ডা বড় সন্তুষ্ট হইল। গিয়া দেখি যে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ, আর তাহার সেই দ্বারে লোকারণ্য। সকলেই জগন্নাথ দেখিতে উৎসুক। পাণ্ডার হাতে মন্দিরের চাবি ছিল, সে চাবি খুলিতে লাগিল। একটা দ্বার খুলিল, মন্দিরের মধ্যে একটা দীর্ঘ দালান দেখিতে পাইলাম। তাহার ভিতর গিয়া পাণ্ডা আর একটা দ্বার খুলিল, আবার একটা দালান দেখিলাম। যখন পাণ্ডা শেষ দ্বার খুলিল, তখন আমার পশ্চাতে হাজার যাত্রী ছিল, 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া তাহারা বেগে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অসাবধানে ছিলাম, তখন তাহাদের সেই লোকতরঙ্গের মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে কোন প্রকারে ধরিয়া সামলাইয়া রাখিল, কিন্তু আমার চশমাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সাকার জগন্নাথকে দেখিবার আর সুবিধা হইল না, আমি সেই নিরাকার জগন্নাথকেই দেখিলাম। এখানে যে একটি প্রবাদ আছে, যে যাহা মনে করিয়া এই জগন্নাথ মন্দিরে যায়, সে তাহা দেখিতে পায়, আমার নিকটে তাহা পূর্ণ হইল।"

আরেক পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হোয়েছিল প্রয়াগ তীর্থে, প্রসিদ্ধ বেণীঘাটে :

> এই ঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তর্পণ করে, স্নান করে। আমার নৌকা পঁহুছিতে পঁহুছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। একজন পাণ্ডা, 'এখানে স্নান কর, মাথা মুণ্ডন কর' বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'আমি এ তীর্থে যাইব না, মাথাও মুণ্ডন করিব না।' আর একজন বলিল, 'তীর্থে যাও আর না যাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও।' আমি বলিলাম, 'আমি কিছুই দিব না, তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করিয়া খাও।' সে বলিল, 'হম্ পয়সা লেকে তব্ ছোড়েঙ্গে, পয়সা দেনেহী হোগা।' আমি বলিলাম, হম্ পয়সা নেঁহী দেঙ্গে, কিস্তরে লেওগে, লেও তো?' এই শুনিয়া সে নৌকা হইতে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল এবং দাঁড়িদের সঙ্গে গুন ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। খানিক টানিয়া আমার কাছে নৌকায় দৌড়িয়া আসিল—বলিল, হম্ তো কাম কিয়া, অব্ পয়সা দেও।' আমি বলিলাম, 'এ ঠিক হইয়াছে,' আমি হাসিয়া তাহাকে পয়সা দিলাম।' [পৃঃ ২২৭—২২৮]

এসব সত্ত্বেও আত্মজীবনী হিসেবে মহর্ষি রচিত গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। "দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বলিতে গেলে তাঁহার ধর্ম্মচিন্তার ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইতিহাস মাত্র।" [পরিশিষ্ট ২, পৃষ্ঠা ৩০২] লোকচক্ষু অন্তরালবর্তী ব্যক্তিসত্তার পারিবারিক ও সামাজিক আচরণের অন্তরঙ্গতম অভিব্যক্তি এখানে বিরল। একেবারে যে নেই তা নয়। সম্পূর্ণ চতুর্দশ পরিচ্ছেদটি তার প্রমাণ। ১০৯-১১০ পৃষ্ঠায় আছে :

> ১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্ম্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও। 'আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটি পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন। আমি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রসস্থ বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর, এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর।

অন্যত্র কোনো কোনো যায়গায় নিজের গ্লানিমিশ্রিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উন্মোচিত কোরেই রুদ্ধ কোরে দিয়েছেন। যেমন ২য় পরিচ্ছেদের একেবারে

প্রথম বাক্যটি, 'এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম।' পরে গোটা পরিচ্ছেদের মধ্যে এর কোন বাস্তব পটভূমি উদ্ঘাটিত হোলো না। অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোরযুবকের অন্তর্দ্বন্দ্বের বোধগম্য কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অচরিতার্থ থেকে গেল। মহর্ষিকে মানুষরূপে পেতে পেতেও পেলাম না। এমন অতৃপ্তির উৎস ৯৯ পৃষ্ঠার আরেকটি উক্তির অতিসংক্ষিপ্ততা।

> গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম! তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম, এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম।.....যখনি নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতাম, তখনই তাঁহার শাসন অনুভব করিতাম, তখনি তাঁহার 'মহদ্ভয় বজ্রমুদ্যতং রুদ্র মুখ দেখিতাম, সকল শোনিত শুষ্ক হইয়া যাইত। [৯৯ পৃষ্ঠা]

নির্জনে অন্ধকারে অনুষ্ঠিত বিপরীত কর্মের ইতিবৃত্ত মহর্ষি প্রকাশ করেননি। এই অনুচ্চারণ ও আত্মগোপন আদর্শ আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত নয়। তুলনায় মীর সাহেবের জবানবন্দী স্পষ্টভাষিতায়, 'মনের কথা' প্রকাশে, ব্যক্তিজীবনের গরলামৃত উদ্গারণে অধিক সাহসী, অধিক সমর্থ।

আট

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, (১ম সং ১৯০৯) ৩য় সংস্করণ কলিকাতা, ১৯৫২

রাজনারায়ণ বসুর লৌকিক জীবনও কীর্তিশোভিত। সেই কীর্তির অসাধারণ শোভার একটি কারণ এই যে উনিশ শতকী বাংলার প্রধান পুরুষদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়. কালব্যাপ্তি ও জনবহুলতায় দেবেন্দ্রনাথ-শিবনাথের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ। 'যে ব্যক্তি যুগপৎ প্রায় তিন পুরুষের অন্তরংগতা লাভ করিতে পারেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের উদার বৈচিত্র্য ও গভীরতা অনুভব গম্য। রাজনারায়ণের সঙ্গে পাইয়া মহর্ষির অধ্যাত্মস্ফূর্তি হইয়াছিল, রাজনারায়ণের অট্টহাসিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ-পাথেয় লাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের সান্নিধ্যে মুখচোরা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন খুশি হইয়া উঠিত। এ মানুষের সমানধর্মা কই।[২৮]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে তাঁর এই ভূতপূর্ব সহপাঠীর মুখ চেয়ে অনেকগুলো কাব্য ও কবিতা রচনা করেছিলেন প্রমাণ তার মিলবে অধুনা অতি পরিচিত মাইকেল-রাজনারায়ণ পত্রাবলীর মধ্যে। প্রচুর আহার কোরে এবং তার চেয়েও বেশী পান কোরে মধুসূদন বিদায় কালে স্নেহে প্রেমে যাঁকে 'জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন' তিনি শ্মশ্রুল রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের কাছেই মাইকেল নিজের প্রচ্ছন্ন প্রত্যয়কে ব্যক্ত কোরে বলেন 'ভবিষ্যত বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।' [পৃঃ ১০৪] রাজনারায়ণ বসুর গোঁফ পর্যন্ত সমকালে কাব্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। রচনাকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যের নাম গুম্ফাক্রমণ কাব্য। নমুনা: পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।

যথা গুম্ফধারী, ভারী ভারী, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে[২৯]

এসব কৌতুকময় দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরোও অনেক ওজনদার তথ্য মজুদ রোয়েছে যার ভিত্তিতে এ কথা অনুমান করা সহজ যে সমসাময়িক শিল্পী সাহিত্যিকরা তাঁর বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুকুমার সেন যথার্থই বোলেছেন যে 'সাহিত্যিক বলিয়া আজ আমাদের কাছে রাজনারায়ণ তেমন পরিচিত নন। অথচ সাহিত্যগুরু বলিতে আসলে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই।'[৩০] রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের মতো ব্রাহ্মণ ধর্মের উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন নতুন তত্ত্ব বা সত্য সংযোজিত করেননি বটে কিন্তু তার সমাজগ্রাহ্য স্বরূপকে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও গ্রহণীয় রূপে প্রচার কোরেছেন। স্বয়ং কেশব সেন, বসুর বক্তৃতা শুনেই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বেঁধেছিলেন বসু 'বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।' জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সস্নেহে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে 'রাজনারায়ণ ধর্মের ডিসপেপসিয়ায় মরমর।' দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে ডাকতেন 'ইংরেজী খাঁ' বোলে কিন্তু ধর্মতত্ত্বের বিচার ও প্রচার বিষয়ে তাঁহার পরামর্শকে বিশেষ মূল্যবান মনে কোরতেন। উপাধিটি যে কত সংগত হোয়েছিল তা ভালো কোরে আন্দাজ কোরতে পারি যখন রাজনারায়ণ নিজের জবানীতে বলেন :

> আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প-বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিল। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান। [পৃঃ ৬২]

সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাসমূহের স্বাপ্নিক ও প্রচারক। 'ইংরেজী খাঁ' বনে তিনি যে কেবল মাইকেলকে বাংগালী কবি হতে অনুপ্রাণিত করেন তাই নয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যেন নিত্যকার সমাজ জীবনে তার স্বকীয় আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোতে পারে তার জন্যেও কম উদ্যোগী ছিলেন না। বসু-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার 'সভ্যরা গুডনাইট না বলিয়া সুরজনী বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখ করিতেন, ইংরাজী বাংলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাংলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।' [পৃঃ ৮১]

রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্ব এই বিচিত্র ঐশ্বর্যের স্মৃতিবাহী বলে তাঁর আত্মচরিত ঐতিহাসিক দলিল এবং সুখপাঠ্য সাহিত্য উভয়রূপেই স্মরণীয়।

দ্রুত উন্মোচনশীল ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্রুত ব্যক্তিবর্গের সংগে রাজনারায়ণ বসুর আত্মিক লেনদেন কয়েক পুরুষে ব্যাপ্ত বোলে সেই স্মৃতিমন্থনজাত আত্মপ্রচারও কয়েকটি বিশেষ গুণে মণ্ডিত। 'তার মধ্যে প্রধান হোলো তাঁর কালচেতনা, সেই চেতনার তৌলন প্রবণতা। সেকাল আর একাল বিষয়ক কথা যে কেবল মাত্র ঐ শিরোনামের বক্তৃতার মধ্যেই বসু সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তা নয়। তাঁর আত্মচরিতেও প্রায় সকল বিশিষ্ট বস্তুর বর্ণনার পশ্চাতে এই কালভিত্তিক তুলনামূলক বচন রচনার প্রবণতা লক্ষণীয়। রাজনারায়ণ বসু সেকাল-একাল বলতে সময়ের যে এলাকা বিভাগ বুঝতেন তার একটা হিসেব হোলো : 'ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কালেজ সংস্থাপন পর্যন্ত যে সময় তাহা "সেকাল" এবং তাহার পরের কাল "একাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।' বিশেষ করে ঐ বক্তৃতার পর তাঁর যুগ চেতনার এই প্রসার সেকালে কতদূর জাহির ছিল সে সম্পর্কে আত্মচরিতে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। 'আমি একদিন কোনো বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীর

দোতালায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম যে, নীচের তলায় তাঁহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে বলিতেছে, 'উপরে কে এসেছে জানিস? সেকাল-একাল এসেছে।' আমার নাম সেকাল একাল হইয়া গিয়াছিল।" [পৃঃ ৯৯]

আত্মচরিত তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত, ১ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশ শৈশব তৎকালীন শিক্ষা, ২০—৫১ পৃষ্ঠা। কর্ম-জীবন, ৫২—২৩৬ পৃষ্ঠা।

প্রথম অংশে একেবারেই আগের কালের কথা। একালে মীর মশাররফ হোসেনের জীবনে যে বিপর্যয় একবার ঘটেছিল রাজনারায়ণের পিতার জীবনে হুবহু তাই ঘটে। তবে পার্থক্য এই যে, রাজনারায়ণের পিতার জীবনে সে অঘটনের কালে চিত্তস্থির রাখতে যিনি সৎ পরামর্শ দেন, তিনি ছিলেন, এক মহান পুরুষ এবং দৈবক্রমে সে অঘটনই পরে মঙ্গলময় বলে প্রমাণিত হোলো। কাহিনীটা এই রকম ঃ

> আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় আর একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে। [পৃঃ ১০—১১]

মাতাপিতামহের আমলে মুসলমানী চালচলনের প্রভাব সম্পর্কে একটি মন্তব্য ঃ

> সেকালে মুসলমান রীতি-নীতি অনুসরণ করিতে আমাদের দেশের ভদ্র লোকেরা ভালবাসিতেন। বড় ঠাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'ঢিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন। [পৃঃ ১৩]

দ্বিতীয় অংশের বিষয় বস্তু আরো সরাসরি আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার তৎকালীন বাংগালীর জড় সমাজে যদিও প্রথম দিকে বিক্ষোভ বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু পরে ক্রমশঃ গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ী বা সংরক্ষণী মনোভাবই বুদ্ধি ও হৃদয়ের উদ্দাম গতিবেগকে অনেক খানি শান্ত ও স্তব্ধ কোরে দেয়। নানা ঘটনা ও চরিত্রের আলোচনার মধ্য

দিয়ে সে কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ রূপে এ বইতে বর্ণিত হোয়েছে। অবশ্য রাজনারায়ণ বসু নিজে শেষ বয়সে স্মৃতিরোমন্থনকারী অন্যান্য সামাজিক 'বৃদ্ধ হিন্দুর' মতো বিশেষ করে সেকাল আর একালে, সেকালের অপস্মৃত মহিমা স্মরণ করে তুলনায় বেশী শোক প্রকাশ কোরেছেন। তবে আমরা সকল সময়ে তাঁর অতি উচ্চারিত সিদ্ধান্তকে সরল সত্য বোলে মেনে নিতে বাধ্য নই। লেখার অন্তরালে সঞ্চরণশীল অনুচ্চারিত ধারণা সমূহকে উহ্যবাহ্য যাবতীয় তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই কোরে, বাছাই কোরে, গ্রন্থিত কোরে তবে আমরা আত্মজীবনী থেকে অতীতের কোনো বিশেষ পর্বের সমাজ-ইতিহাসকে পুনর্গঠিত কোরতে সমর্থ হবো। সে বিশ্লেষণ রীতির নানা স্তরে প্রবেশ না করে বর্তমান বর্ণনামূলক প্রবন্ধে আমরা শুধু প্রাসংগিক ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সমূহ একত্রিত কোরে উপস্থিত কোরছি।

ইংরেজ লেখকদের মধ্যে মেকলে ছিলেন, 'এজুদের' পরম পূজনীয় শিল্পী ও মনীষী। কিন্তু রাজনারায়ণের সাক্ষ্য থেকে এ কথা জানতে পারি যে সেই প্রতাপশালী মেকলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় লয় পেতে সুরু করেছেন। 'তখন আমরা মেকলে খোর ছিলাম। তাঁহাকে ইংলেণ্ডের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহার শত শত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (এসে) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে।' [পৃঃ ৩৭] কলেজ পড়ুয়া ছেলেরা মেকলে ছাড়াও আরো দুএকটি বস্তুর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন। তবে আরো আগেকার যুগের তুলনায় এই আসক্তি অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের। কারণ 'তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্ব্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল, গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। [পৃঃ ৪৫]। সমকালীন তারুণ্যের অস্থিরতাকে আর্দ্রচিত্তে লোচন করে দরদী রাজনারায়ন এই অতিরিক্ত পানাসক্তির যে আদর্শগত কারণ ব্যখ্যা করেছেন তাও বিশেষরূপে বিশ্লেষিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দাবী রাখে: 'তাহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন।' [পৃঃ ৪৫]। ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রিয়া কর্মের সংগে পর্য্যন্ত সে সময়ে পানাহারের যে

যোগ অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে রাজনারায়ণের সক্ষ্য সত্যানুসরণে কুণ্ঠাহীন। 'যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। ..... খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চৈতন্য হইয়াছিল।' [পৃঃ ৪৯]

ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বগত ও প্রতিষ্ঠানগত বিবর্তনের অনেক মঞ্চান্তরাল দৃশ্য রাজনারায়ণ বসু তাঁর উদার কৌতুকবোধ নিয়ে বর্ণনা কোরেছেন। মহর্ষির জীবিত কালেই তাঁর অনেক প্রিয় বিশ্বাস ও সংস্কার নবীন ব্রাহ্মদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের তাড়নায় বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হোয়েছে। রাজনারায়ণ বসুর বর্ণিত কোনো কোনো সংক্ষিপ্ত দৃশ্য সেই স্মৃতিতে দীপ্যমান। মহর্ষি ও কেশব সেন প্রসংগে আলোচনা কোরতে গিয়ে বসু মহাশয়ের চিত্তপটে যে চিত্রটি ঝলক দিয়ে উঠেছে সে হোলো : 'কেশব বাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এ দিকে দেবেন্দ্র বাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন।' [পৃঃ ১০৩]। কিন্তু দৃশ্য বা চিত্র চিত্রণের চেয়ে চিন্তা বা তত্ত্বের প্রামাণ্য দলিল পেশ করায় রাজনারায়ণের উৎসাহ বেশী। তাই তিনি মহর্ষি ও অক্ষয় দত্তের মধ্যে যে ভাবদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল, স্বকীয় দৃষ্টিতে বিচার কোরে তার সার ব্যক্ত কোরতে কুণ্ঠিত হননি। এবং সে বিচার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট সুচিন্তিত এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বোলেই মূল্যবান।

> দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক, অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। ... ব্রাহ্ম সমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা যাহা স্থিরকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাঁহাকেই দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্ব্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্তন আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে ইহা তাঁহারা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না। রক্ষণশীল স্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো গৌরবের বিষয়। [পৃঃ ৬৭-৬৮]

নিজের ধর্মমতের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কেও অনেক মনোজ্ঞ গল্প করেছেন। একটি কাহিনীর ভূমিকা স্বরূপ এক জায়গায় এমন কথাও বোলেছেন যে, 'শেভালিয়র র‍্যামজের "সাইরাসেজ ট্র্যাভেলজ্" পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের "অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ্ দি প্রিসেপ্টস্ অফ্ জীসাস" এবং চ্যানিংগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই. পরিশেষে কলেজে ছাড়িবার অব্যহিত পূর্ব্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই।" (পৃঃ ৪৩) তত্ত্ব বা তত্ত্বমগ্ন চরিত্রাংশে এই শ্রেণীর বিশ্লেষণ মূলক সরস আলোচনাই রাজনারায়ণের আত্মচরিতের প্রধান আকর্ষণ। আত্মচরিত হিসেবে গ্রন্থের দুর্বলতাও এইখানে। সম্পাদক হরিহর শেঠ অবশ্য ভূমিকায় বোলেছেন যে 'তিনি গ্রন্থখানিতে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ঘটনাবলীর শুধু উল্লেখ বা বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার মূল্যবান অনুভূতি বা উপলব্ধিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম 'আত্মজীবনী' 'জীবনস্মৃতি' এসব কিছু না দিয়া 'আত্মচরিত' দেওয়া হইয়াছে, ইহা খুব সমীচীন হইয়াছে, কারণ ইহাতে তাঁহার চারিত্রিক দুর্বলতা বা গুহ্যকথাও কিছুমাত্র গোপন করা হয় নাই।' কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। 'আমার প্রথম বিবাহ সেয়ালদহের রামমোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসর কন্যাটির বয়স এগার বৎসর। আমার এখানে কুলকর্ম হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আদ্যরস হাটখোলার দত্তদিগের বাটিতে হয়। ইহা পরে বিবরিত হইবে। ... একুশ বৎসরে আমার আদ্যরস হয়।' (পৃঃ ৩৫) —এই ঘোষণার মধ্যে আত্মজীবনী সুলভ অকপটতার আভাস থাকলেও তা এত অপরিপুষ্ট এবং অনুরূপ স্বীকারোক্তি সমগ্র গ্রন্থে এতো ক্বচিৎদৃষ্ট যে তার মধ্যে লেখকের ইন্দ্রিয়াধীন দুর্বল মানবীয় সত্ত্বা প্রতিফলিত হোতে পেরেছে বোলে মনে হয় না। কি করে নিজের পিতার কাছে পরিমিত মদ্যপানের শুভপাঠ গ্রহণ কোরলেন (পৃঃ ৪৭), খানা খাওয়া ও মদ্যপানে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মাছের ঝোল ও সর্ষের তেলের প্রতি যে তাঁর ভক্তি বরাবর অচল ছিল (পৃঃ ৬৯) —সেসব স্মৃতিকথার মধ্যে অন্তরংগ মানুষের যে মাঝে মাঝে উন্মোচিত হয়েছে তা আরো বহুল ও বিস্তৃত, বিনীত ও বিশ্রব্ধ হোলেই আমরা অধিক আনন্দিত হোতাম, আত্মচরিতও যথার্থ শিল্পরূপ লাভ কোরে আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি সাধন কোরতে পারতো।

নয়

নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, কলিকাতা, ১৯০৮-১৯১৩।

নবীন চন্দ্র সেনের আমার জীবন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। লেখক প্রতি খণ্ডকে ভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩১৪, সালে (ইং ১৯০৮), দ্বিতীয় ভাগ ১৩১৬, তৃতীয় ভাগ ১৩১৭, চতুর্থ ভাগ ১৩১৮, পঞ্চম ভাগ ১৩২০ সালে। বাংলাভাষায় এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পূর্ণাংগ আত্মজীবনী। লেখক শৈশব থেকে প্রৌঢ় কাল অবধি জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ইতিহাস অকপটে ব্যক্ত কোরতে প্রয়াস পেয়েছেন। শৈশবে যা ঘটেছে, কৈশোরে যা অতিক্রম কোরতে হোয়েছে, পুরুষ চিত্তে যা উন্মাদনা এনেছে, কবি চিত্তে যা রেখাপাত কোরেছে, হাকিমী জীবনে যা আত্মপ্রসাদজনিত পরিতৃপ্তি দান কোরেছে তার বিচিত্র, বিস্তৃত এবং পুংখানুপুংখ কাহিনী একটা দিলখোলা আসর জমানো মনমাতানো মজলিসী ঢংগে বলা হোয়েছে। স্বভাবতই নবীন সেনের কণ্ঠ উচ্চ, ঘোষণারীতি নাটকীয়। বিনয়ের নিবেদনও এখানে আত্মগৌরব প্রচারের স্থূল চেতনাকে, হিতোপদেশ বিতরণের মহৎ আকাংখাকে প্রচ্ছন্ন রাখে নি।

> আমার জীবন?—আমার মত লোকের জীবন লিখিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? অসংখ্য কুসুমরাশির মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরভ ও শোভাবিহীন ফুল কোথায় অনন্ত অরণ্যের নিভৃত স্থানে ফুটিয়া ঝরিতেছে, অসংখ্য নক্ষত্র খচিত আকাশতলে অসংখ্য জোনাকিরাশির মধ্যে যে একটি জোনাকি কোথায় অনন্ত প্রান্তরের অন্ধকারতম প্রদেশে ফুটিয়া নিবিতেছে, অনন্ত জগতের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার জীবন কে জানিতে চাহে? তথাপি ইহারা এই জ্ঞানাতীত বিস্ময়পূর্ণ বিশ্বের অংশ! অহো কি রহস্য! তাহাদের দ্বারাও এই মহাসৃষ্টিযন্ত্রের কোন কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা না হইলে তাহাদের সৃষ্টি হইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টি নিষ্ফল নহে। সেইরূপ আমার মত ক্ষুদ্র মানবের দ্বারাও অবশ্য কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছিনা। যখন মনে এরূপ ভাবের উদয় হয়, যখন ভাবি যে, এই মহা রঙ্গভূমে, যেখানে সৌরজগৎ প্রভৃতির অনন্তকাল হইতে অনন্ত অভিনয় হইতেছে, আমিও তাহাতে রূপান্তরে অনন্তকাল হইতে অভিনয় করিয়া আসিতেছি, তখন হৃদয় কি আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়! তখন

আমাকে আর একটি ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতংগবিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। তখন আমি এই অনন্ত অভিনয়ক্ষেত্রের অনন্ত অভিনয়ের এক জন অনন্ত অভিনেতা। কিন্তু যখন চিন্তারাজ্য হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন আবার আপনার ক্ষুদ্রত্বে আপনি ম্রিয়মাণ হই। কই, এই জীবনের কার্য্যকারিতা ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমার জীবন জানিবার জন্য সময়ে অনেকে পত্র লিখিয়াছেন। একজন বারংবার অনুরোধ করাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমার জীবন তিনটি মহা ঘটনায় পরিপূর্ণ—জন্ম, বিবাহ, দাসত্ব। আর একটি ঘটনা এখনও বাকি আছে, তাহা—মৃত্যু। তাঁহাকে আরও লিখিয়াছিলাম যে, এ শিরস্ত্রাণ বাংলার বড়লোক মাত্রকেই খাটিবে।

তবে আজ স্বয়ং আপনার জীবন লিখিতে বসিলাম কেন? ইচ্ছা ভূত জীবনের দর্পণে একবার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া কিরূপ দেখায়, দেখিব। দেখিয়া তাহার একটী মন্দ রেখাও পরিবর্ত্তন করিতে পারি কি না, চেষ্টা করিব। এই মধ্য-জীবনে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল বন্ধুর বিলোড়িত অরণ্যানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব, এই সাহস, এই শিক্ষা, এই সান্ত্বনার আশায় আজ আত্মজীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম। [১ থেকে ৩ পৃঃ, প্রথম খণ্ড]।

দেওয়ান কর্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের এরূপ অভিলাষ ছিল, মীর মশাররফ হোসেনও এরকম ভাবনার দ্বারা পীড়িত হোয়েছেন। এই আত্মজীবনীত্রয়ের উপক্রমণিকা অংশের ভাবের এই ঐক্য চোখে পড়ার মতো। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রাজনারায়ণ বসু কিম্বা শিবনাথ শাস্ত্রীর নিজ নিজ চরিত্রের গরিমা প্রচারে উদাসিন ছিলেন এমন বলি না। তবে তাঁদের ব্যক্তি জীবনের মহিমা সুবিদিত। তাঁদের যুগ নির্ম্মাণকারী সামাজিক কীর্ত্তিকলাপ সর্বজন স্বীকৃত। আত্মকাহিনীর মধ্যে তাঁর অন্তরংগ পরিচয় লাভ কোরে আমরা একটা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কৌতূহলকে নিবৃত্ত করি মাত্র; বর্ণিত অভিজ্ঞতার অসাধারণত্ব বা অতি সাধারণত্ব লক্ষ্য কোরে মনে অবিশ্বাস বা ঔদাসীন্যের সৃষ্টি হয় না।

আত্মজীবনীতে উপন্যাসের কলারীতি অনুসৃত হলেই সেটা অপরাধ বলে বিবেচ্য নয়। লেখকের আত্মসাক্ষাৎকার শিল্পরূপে প্রাণময় করে তুলবার জন্যে নাটক উপন্যাসের রস রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা লেখকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক তবে উপন্যাস ও আত্মচরিতের মধ্যে যে উপাদানগত মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান,

কল্পনার স্বাধীনতা ও অধীনতা দুয়ের মধ্যে যে মাত্রায় বিধৃত, কাহিনীর পরিচর্যায় যত্ন ও অযত্ন উভয়ের মধ্যে যে পর্যায়ে প্রকাশিত তার অস্বীকার মাত্রেই পীড়াদায়ক। আত্মজীবনী বাস্তব বোলেই যে আবেদনগত তীব্রতা সে কাহিনীর স্বাভাবিক প্রাপ্য, এরকম ক্ষেত্রে আত্মকাহিনী সে মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মচরিত রচনার নিজস্ব কৌশল যদি তা রক্ষা কোরতে না পারে, উপন্যাস থেকে ধার করা ভাষা ও কলার ছল সে বঞ্চনাকে বাড়াবে বই কমাবে না। দেওয়ান সাহেব, মীর সাহেব ও নবীন সেন নিজেদের জীবনের কথা বোলতে গিয়ে কখনো কখনো এই অকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বোলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করবেন। সম্ভবতঃ নবীন সেনের স্বভাবের মধ্যেই একটা কলাশ্রয়ী অতিপ্রত্যয়ের প্রবণতা অত্যাধিক পরিমাণে ছিল। তাই তাঁর জীবনী পাঠ কোরে প্রমথ চৌধুরীর যে ধারণা জন্মে তা হোলো: এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবন চরিত্র হলেও একখানি নভেল বিশেষ। অরে সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।

নবীন সেন সমকালের একাধিক প্রধান পুরুষদের সান্নিধ্য লাভ কোরেছিলেন। তাঁদের চরিত্র চিত্রণে তিনি নৈপুণ্য ও স্বকীয়তা প্রদর্শন কোরেছেন তা সামগ্রিকভাবে আমার জীবনকে অধিকতর পঠনীয় ও রসপুষ্ট কোরে তুলেছে। একটি হ্রস্ব দৃষ্টান্ত:

> ভগবানের কি রহস্য বুঝিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারী বাবু ও কৃষ্ণদাস পাল তখন বাংলার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনেরই চরিত্র দেবতুল্য, কিন্তু তিনেরি কদাকার। (১৪২ পৃঃ, ১ম খণ্ড)

এই চরিত্রচিত্র সমূহের মধ্যে বিদ্যাসাগর ১ম ভাগে, বঙ্কিম ২য় ভাগে, রবীন্দ্রনাথ ৪র্থ ভাগে—এই ত্রিমূর্তিই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত। সাহিত্য সাধক চরিতমালার তৃতীয় খণ্ডে, নবীনচন্দ্র সেন পুস্তিকায়, ৫০ থেকে ৬৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলো রোয়েছে তা এই চরিত্রালেখ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমূহের সংকলন। চরিতমালার লেখকের মতে "নবীনচন্দ্র সেন স্বভাব-কবি ছিলেন, তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, মস্তিষ্কের সহিত তাঁহার কাব্যের কচিৎ যোগ ছিল। এই কারণে আমার জীবন লিখিতে বসিয়া তিনি ডেপুটি নবীনচন্দ্র, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক নবীনচন্দ্র, স্বদেশবৎসল নবীনচন্দ্রের, আত্মম্ভরী নবীনচন্দ্রেরই পরিচয় দিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্র কুত্রাপি আত্মপ্রকাশ করে নাই।" এই সিদ্ধান্ত তর্ক সাপেক্ষ।

নিজের জীবনের অনেক সাফল্য ও সংকট বর্ণনায়—যেমন ১ম ভাগে পিতৃহীন যুবকের দুর্দশার চিত্র অংকনে তিনি তার প্রকৃত সংবেদনশীল কবি হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। সূক্ষ্মতর অর্থে, তার কবিতার শক্তি ও অশক্তির মূলে যে অনিয়ন্ত্রণ, লঘুগুরু ভেদজ্ঞানের অস্থিরতা, আবেগ ও দুর্দমনীয় তরংগোচ্ছাস ক্রীয়াশীল, নিজের অন্তরংগতম সত্তার এই মৌল পরিচয়কে নবীন সেন যথেষ্ট রূপে ব্যক্ত কোরেছেন। প্রথম অনুরাগের স্মৃতির উজ্জ্বলতার সাক্ষী :

> অবশেষে উঠিলাম, আত্মহারাবৎ চলিয়া যাইতেছিলাম, অন্ধকারে বারণ্ডা পার হইতে বক্ষে কি লাগিল? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার সে কুসুম-স্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল—আহা! কি স্পর্শ! বুঝিলাম আমার বুকে মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ। অজ্ঞাতে আমার দুই ভুজ তাহাকে আরো বুকে টানিয়া ধরিল। আমার শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আপ্লুত হইয়া নিশ্চিল হইল। বালিকা আমার করে একটী গোলাপ ফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে গুরু ঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে উর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইলাম। (৬০ পৃষ্ঠা, ১ম ভাগ)

নিজের কাব্যপ্রবণতার স্বরূপ বর্ণনায় তা স্বপ্রকাশিত :

> "অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। (১২৯-৩০ পৃষ্ঠায়)

গীতিকাব্য রচনায় ও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশে তিনি যে হেমচন্দ্রের চেয়ে শতগুণে বড় এই দাবী সজোরে প্রচারের মধ্যেও এই মানসিকতা পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করতে বসে, তুলনীয় ঘটনা হিসেবে অবলীলাক্রমে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের ঐতিহাসিক মিলনের চিত্রটি উপস্থাপিত করেছেন। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করব। বিষয় : রৈবতক কাব্য ও কবির কৃষ্ণভক্তির অংকুর অনুসন্ধান।

> কিরূপে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী যুবতী আমার বক্ষের উপর পড়িয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া, তাহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে বলে,... তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে চলিয়া গেলে, দর্শন মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারস্থ সোপান

পার্শ্বে কৃত্রিম সিংহে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া আমি ভাবিলাম যে যদি একটি যুবতী কেবল জগন্নাথ দর্শনের জন্য ভক্তিতে এরূপ আত্মহারা হইয়া একজন অজ্ঞাত পুরুষের বক্ষে এরূপ পড়িতে পারে, তবে এরূপ রমণীরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে তাঁহাকে লইয়া যে ব্রজলীলা করিবে, রাসরাত্রিতে আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া তাঁহাকে যে শ্রীভগবান্‌জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। (১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড।)

॥ দশ ॥

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র) কলিকাতা, ১৯১৫ ॥

এই প্রবন্ধের সূত্রপাত হয় মীর আত্মজীবনীর সারাংশ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। ভূমিকা হিসেবে বাংলা আত্মজীবনীর সাধারণ বর্ণনায় উদ্যোগী হই। আমাদের আলোচনার অন্তর্গত জীবনচরিত সমূহের সীমানা নির্দিষ্ট কোরেছি ১৯১৮ তে, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত প্রকাশের কাল পর্যন্ত। মীরের পর ও শিবনাথের পূর্বে প্রচারিত আত্মমানস উদ্ঘাটনমূলক উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিত্র পাই মাত্র দুটো। এক রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, দুই আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)। এই শেষের বইটির কেবল মাত্র প্রথম অংশই আমাদের জন্যে প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় অংশে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও ভাষা বিষয়ক নানা তত্ত্বের তথ্যবহুল আলোচনা। এই অংশে ব্যক্তি চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন কোরতে বা আত্মসত্তার তাৎপর্যপূর্ণ পরিমণ্ডলটি উজ্জ্বল কোরে তুলতে লেখক প্রয়াস পান নি। বাল্যকথা বর্ণিত হোয়েছে ৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, চলতি বাংলায়। তারপর ২৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বোম্বাই প্রবাসের কথা সাধু ভাষায়। চিত্রটি যে প্রধানতঃ বোম্বায়ের, ব্যক্তির নয়, এ সচেতনতা সত্যেন্দ্রনাথেরও ছিল। দ্বিতীয় অংশের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলে দিয়েছেন, 'এই ভাগের অনেক কথা আমার প্রণীত বোম্বাই চিত্র হইতে সংগৃহীত।'

বাল্যকথার প্রধান আকর্ষণ সত্যেন্দ্র সত্তার বিশিষ্ট পরিবেশের প্রাণময় বর্ণনা, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক ইতিবৃত্ত। বাংগালীর জীবনে ও সাহিত্যে পরিবারের মেয়ে-পুরুষের প্রভাব এত বিচিত্র পথে সঞ্চারিত যে, তার অনুধ্যান স্বভাবতঃই প্রীতিকর। অন্ততঃ দু'জন বহুশ্রুত ব্যক্তিত্বের বর্ণ-রঞ্জিত জীবন চিত্র এখানে আছে—যা অন্যত্র অপ্রাপ্য। একজন হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৬৪ সালে তিনি তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে পত্র লেখেন, তার স্মরণীয় উদ্ধৃতাংশটুকু এরূপ ঃ

> আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই, ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয় পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।
>
> (মূলের বাংলা অনুবাদ পৃঃ ৭।)

দ্বারকানাথ যখন ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার অন্তর্গত ওয়ার্দিংএর এক হোটেলে থাকতেন তখন তাঁর "সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারী, একজন Interpreter, সংগীত ওস্তাদ জার্ম্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্ব্বদা কাছে থেকে তাঁর অবশ্যকমত কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল।" (৮ পৃষ্ঠা)। প্রোফেসর ম্যাক্সমুলার সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর পিতার প্যারিসে বাসকালীন জীবনযাত্রা বর্ণনা কোরতে গিয়ে বোলছেন,

> ১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল।... তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল।.....দ্বারাকানাথ প্যারিসে খুব জাকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়—দ্বারাকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত

ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্খার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায় কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন। (১১—১৪ পৃষ্ঠা।)

দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কাব্য সাধনা, তত্ত্ববিদ্যানুশীলন, গণিতশাস্ত্র চর্চা, বাক্যরচনা প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন, বাংলা রেখাক্ষর বর্ণমালার উদ্ভাবন, এমন কি তিনি যে 'সাঁতারে সর্ব্বাপেক্ষা মজবুৎ ছিলেন। তাঁর রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও তিনি যে কত কারদানী করতেন তার ঠিক নেই।' (৪৬ পৃষ্ঠা) —বড়দাদার সকল কথাই সত্যেন্দ্রনাথ বড় দরদ দিয়ে সরস কোরে বর্ণনা কোরেছেন।

এগার

শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, নতুন সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৩৫৯ (প্রকাশ ১৯১৮)॥

আলোচ্য কালের মধ্যে রচিত আত্মচরিত সমূহের মধ্যে এইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ। একশ' বছর আগে শিক্ষিত হিন্দু বাংগালী যে ভাবোন্মাদনা ও কর্মানুপ্রেরণার জোয়ার অনুভব কোরেছিলেন তার শেষ প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণক হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, কেশব সেন সকলের সান্নিধ্যই তিনি লাভ কোরেছিলেন। তাঁদের স্নেহ অর্থ শ্রম স্বপক্ষে লাভ কোরে শিবনাথ নিজের অনেক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত কোরতে সমর্থ হন। তখনকার উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুর ধর্মীয় চেতনার মুক্ত বুদ্ধির আলো যে সাধনকর্মের পথকে দ্যুতিময় কোরে তোলে শিবনাথ শাস্ত্রী সে পথেরই একজন ব্রাহ্ম পথিক ও পথপ্রদর্শক। স্বভাবতই তাঁর জীবনবৃত্ত যে মণ্ডলকে ঘিরে পূর্ণতা লাভ কোরেছে তার আন্তর কাহিনী আত্যন্তিক মূল্যে ঐশ্বর্যশালী। যেমন,

"একদিন আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন তাঁহার জোড়াসাকোস্থ ভবনেই আছেন। গিয়া দেখি, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তিনজনে অনেক কথা আরম্ভ হইল। মহর্ষি রাজনারায়ণ বাবুকে ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজনারায়ণ বাবুতে ও আমাতে মিলন,

> মহর্ষির নিকট যেন মণিকাঞ্চনের যোগ বোধ হইল, তাঁহার হৃদয় দ্বার খুলিয়া প্রেমের উৎস আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল, তিনজনের অট্টহাস্যে অত বড় বাড়ি কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নির্ঝরের সুস্নিগ্ধ বারির ন্যায় মহর্ষির বাক্যস্রোতে হাফেজ আসিলেন, নানক আসিলেন, ঋষিরা আসিলেন, উপনিষদ আসিলেন, আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম। দেখিতেছি, মহর্ষির কান দুটা লাল হইয়া যাইতেছে মহর্ষির মস্তকের কেশ মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া উঠিতেছে।...এমন সুন্দর, এমন পবিত্র এমন অকপট হাস্য মানুষে কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অট্টহাস্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মহর্ষির হাস্য বড় কম চিত্তাকর্ষক ছিলনা। তবে তিনি সকলের কাছে হাসিতেন না, নিতান্ত অনুরক্ত লোকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিত। (১৫৮—৯ পৃষ্ঠা)

ব্যক্তিচরিত্রের এই মহিমা ও পরিবেশের এই সম্মোহন শক্তি দেবেন্দ্রনাথ বা রাজনারায়ণের জীবন-জীবনীতেও বিদ্যমান। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত অতিরিক্ত আরো কিছু সদগুণের অধিকারী বোলে তা সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়।

এই বিশেষ গুণটি শিবনাথের শিল্পীসত্ত্বার দান। তিনি কর্মী ছিলেন, ভাবুক ছিলেন এবং লেখকও ছিলেন। কথার তিনি দক্ষ কারিগর, তাঁর দৃষ্টি পরিণত শিল্পীর। শৈশবে যেদিন পাঠাভ্যাসের জন্য

> বাবা আমাকে কলিকাতা আনিলেন। সেদিনকার কথা আমি ভুলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে, বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হাম্‌লায়, তেমনি আমায় মা সেদিন হাম্‌লাইতে লাগিলেন। (৯৩ পৃষ্ঠা)

নিরামিষাশী শিবনাথ তাঁর তরুণ বয়সের পাঠানুরাগ বর্ণনা কোরতে গিয়ে বলেন ঃ

> যখনই কোন ভালো গ্রন্থ হাতে পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র যেমন আমিষ খণ্ডের উপরে পড়ে, সেইভাবে তাহার উপরে পড়িতাম। (৪০ পৃষ্ঠা)

আক্ষেপের বিষয় এই যে, "শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন দিগভ্রষ্ট সাহিত্যিক। ইঁহার অন্তরবাসী কবি মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মতো সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষক ও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাবে স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন।"[৩১] "ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত বঙ্গ-ভারতীর সেবায়

আত্মোৎসর্গ করিলে যে তিনি কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার নিদর্শন অক্ষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার গ্রন্থ পুষ্পমালা এবং উপন্যাস মেজ-বৌ যুগান্তরেই পাই।"[৩২]

এই আত্মচরিতের লেখক কথাসাহিত্য রচনার সূক্ষ্ম কলা কৌশলকে অনায়াসে এবং অলক্ষ্যে নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রয়োগ কোরেছেন। যুগান্তরে প্রতিভার যে বিশিষ্ট পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আত্মচরিতেও তার প্রকাশ স্পষ্ট। আত্মচরিতের অনেক চরিত্র প্রসংগেই বলা চলে, "এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গ সাহিত্যে দুর্লভ।"[৩৩] এতোগুলো চরিত্র এতো জীবন্ত ও নিপুণভাবে বাংলা অন্য কোনো আত্মজীবনীতে চিত্রিত হয় নি। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র উদ্ধৃত কোরব।

প্রপিতামহের বয়স ৯৫ বৎসর। চোখ জ্যোতিহারা। শিবনাথ তাঁকে 'পো' বোলে ডাকতেন।

> "আমাদের বাড়িতে প্রায়ই ২।৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর ছিল। পোর পাতের মাচ চুরি করিয়া খাইত, তিনি দেখিতে পাইতেন না। এই জন্য মা প্রথম প্রথম পোকে আহারে বসাইয়া বাম হস্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন, বলিয়া আসিতেন, "মধ্যে মধ্যে বাড়িগাছটা আপ্‌সো বেরাল আসে। পো মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটা লইয়া বিড়ালের উদ্দেশ্যে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পোর পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো তাহার উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পোর পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন, আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম।

আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না, এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি নিয়ম ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইশারাতে ডাকিতে লাগিলেন, "উ, উ!" অর্থাৎ কে আমাকে ছুঁইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন, পেটুক পুত্রটির হাতে মুখে দইয়ের দাগ, আর লুকাইবার যো নাই। পোর কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উ কি? ঐ 'বাবা'। বড় যে আদর দেও!" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, 'হাঃ হাঃ, বেশ করেছ, তবে ওই সব থাক,' বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তো বেড়াল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেড়াল হয়েছে।" (৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

পিতা সম্পর্কে বাল্যস্মৃতি আরো রোমাঞ্চকর। তখন শিবনাথের সদ্য বিয়ে হয়েছে। নিজের বয়স বারো তেরো। স্ত্রী প্রসন্নময়ীর ন'দশ।

বিবাহ উৎসব শেষ হইতে না হইতে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। আমার বিবাহের কয়েকদিন পরেই আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক জেঠার এক কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনো প্রসন্নময়ী আমাদের বাড়িতে আছেন, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যান নাই এবং তাঁহার পিত্রালয় হইতে যাঁহারা সংগে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ তখনো আছেন। আমার ঐ জ্যাঠতুতো বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলেরা বরযাত্রীদিগের সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চবর্ষের গুঁড়া দিয়া আসন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল, আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আমার বড় পিসীর মেজো ছেলে রামযাদব চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুষাঘুষি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মা এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং দুই জনের কানে ধরিয়া থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। মেজদাদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়িতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, "মামী-মা মায়ে পোয়ে পড়ে আমায় মেরেছে।" বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিলেন না, ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলেন না, একেবারে আগুন হইয়া গেলেন, এবং আমার এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মায়ের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

ইহার পর সন্ধ্যার প্রকালে মা আমাকে বলিলেন, "আজ তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শিগগির খেয়ে, ভটচায্যি পাড়ায় যাত্রা হবে সেখানে গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোন। কর্তার রাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আসবে।" মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যার পূর্বে আসিতেছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি শুনিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন, "তোরা কাকে এমন করে গালাগালি দিস যে রাস্তা হইতে শোনা যায়?" আর কোথায় যায়! বড়পিসী বাবার কানে মার নামে অনেক কথা ঢালিয়া দিলেন। বাবা আর কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কিনা জানি না আমার মায়ের উপরে কি বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাঁহার মনে চিরদিন এই একটা ভাব ছিল যে, তাঁহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তাহার নামে কেহ কখনো অভিযোগ করিবে না, তাহার কোন দোষ কেহ দেখাইবে না, সে সকল দোষের ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে। সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি না, জানিনা। যাহা হউক, যখন মায়ের ত্বরাতে আমি রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলেন। হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পাজীটা কোথায়?" আমার মা দুইহাতদিয়া রান্নাঘরের দরজার দুইকাঠ ধরিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "সে ঘরে নাই।" আমি বুঝিলাম, বাবা যদি রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে আসেন, মা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, বাধা দিয়া রাখিবেন কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না, বলিলেন, "দাখানা দাও দেখি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দা কেন?" বাবা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি? দাও না।" মা দা খানা বাহির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া পিছনের দ্বার দিয়া খানা খন্দ বন জঙ্গল পার হইয়া ভট্টাচায্যি পাড়ায় যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় ধরিল। আমি বলিলাম, "কে রে?" স্বপ্নেও ভাবি নাই যে বাবা সেখানে আসিয়া ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি, বাবা! তিনি আমার পিঠে দুঘুষা দিয়া বলিলেন, "খবরদার কাঁদতে পারবি না।" সে ঘুষা খাইয়া কান্না গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হইয়া পড়িল। কি করি, কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে

অবস্থায় আমাকে বাড়ি লইয়া গেলেন, এবং উঠানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস নে, আমি আসছি।" এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্য যে বাঁশের ছড়ি কাটিয়া গোলার গায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন, মা যে তৎপূর্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে না থাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, পিসতুতো দিদি, বিবাহ বাড়ির লোকেরা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে! পালা পালা, মার খাবার জন্য কেন দাঁড়িয়ে থাকিস। আমি বলিতে লাগিলাম, "না, আমি যাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়েছেন।" এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছা না পাইয়া, কি দিয়া মারিবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, তখন বড়পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ওরে ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠের বাড়ি মারলে কি ছেলে বাঁচবে!" এই বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ভাইবোনে লুটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসিকে এরূপ ধাক্কা মারিলেন যে তিনি তিন চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের মূর্তির ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মানা, সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া নাই চড়া নাই। বাবার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা-ও নড়ব না।" বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে দেখ।" এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথায় ও পিঠে চেলা কাঠ পড়াতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলা কাঠের কয়েক ঘা খাইয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল, আমার চারিদিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়া গেলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোয়ানো হইয়াছে, এবং দুই তিনজন লোক তার্পিন তেল দিয়া আমার গা মালিশ করিতেছে, বাবা আপনি তেল জোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া 'মা মা' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির নিকটস্থ জংগলে গিয়া পড়িয়া আছেন। আমার

চেতনা হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্য গেল। একজনের পর একজন গেল, তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, "কৃষ্ণচরণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে ছেলে বেঁচে আছে, তবে আমি যাব, আর কারও কথাতে যাব না।"

এই কৃষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন তিনি বড় ভক্ত ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে 'ভক্ত কৃষ্ণচরণ' বলিয়া ডাকিত। সেই রাত্রে কৃষ্ণচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে আসিলেন, এবং আমার সহিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিতে গেলেন। মা তাঁহার কথা শুনিয়া জংগল হইতে উঠিয়া আসিলেন, এবং "বাবার, তুই কি আছিস্?" বলিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে, আমার যখন চেতনা হইল, তখন আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ জেঠামো করিয়া বলিতে লাগিলাম, "আমি মেজদাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, মারামারি করেছিলাম, দোষ হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু লঘুপাপে এত গুরুদণ্ড দেওয়া বাবার পক্ষে কি ভালো হয়েছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়িতে রয়েছে, পাশেরবাড়িতে কুটুমরা এসেছে, তাদের সমুখে এত মারা কি বাবার পক্ষে ভালো হল?" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম, বাবা অদূরে মাটিতে নাক ঘষিয়া মাকে খৎ দিতেছেন। (৪৮—৫১ পৃষ্ঠা)

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতা গোলকমণি এই গ্রন্থের উজ্জলতম সম্পদ। বিশেষ কোরে পিতা হরানন্দ। শিবনাথ যখন পিতার কাছে এই সংবাদ প্রেরণ কোরলেন যে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন এবং উপবীত ত্যাগ কোরেছেন তখন

"পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ শুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনো শোনে নাই। সুতরাং এই সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন কি, দুই চারি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা ভাবিলে এখন হাসি পায়। একদিন প্রাতে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটি চাষার মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিঃশ্বাস পড়ে কি না পড়ে তন্মনস্ক! আমার হস্ত-পদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি যখন বলিলাম, "মা, একটু তেল

দাও, নেয়ে আসি," তখন একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকুরুণ, কথা কয়?" মা বলিলেন, "কথা কবেনা কেন?" শুনিয়া আমার ভয়ানক হাসি পাইল।... আর একদিন একটি স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি মুড়ি খাইতেছি। দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ও মা, এই যে মুড়ি খায়, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই?"

যাহা হউক, বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।... শেষে বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফল বোধে আমাকে বিদায় দিলেন।.... তিনি অতি সহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজ ব্যয়ে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে, আমাকে জন্মের মতো বর্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুখ দর্শন করেন নাই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।...

... কিন্তু আমি জননীর জন্য বাড়ীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না।...আমার পিতার ইচ্ছা নয় আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাঁহাকে গোপন করিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতকালে বাড়ীতে যাইতাম। তিনি লোক-মুখে আমি মার কাছে গিয়াছি শুনিলেই, আমাকে প্রহার করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া আসিতেন। পাড়ার ছোট ছেলেরা আমাকে বড় ভালোবাসিত। বাবা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধূলি লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইতাম।... আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্য ২২৲ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২৲ টাকা ব্যয় সামান্য প্রতিজ্ঞার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে ভালো হইত।" (পৃঃ ৯৭—৯৮)

নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কেউ গোপনে বানচাল কোরতে উদ্যোগী হোলে হরানন্দ ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য পোড়তেন তার, দৃষ্টান্ত ঃ

"আমি যখন ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে কর্ম করি, তখন আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহ ব্যয়ের সাহায্যার্থ গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে, বাবা তাহা জানিতে পারিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল।" (পৃঃ ২০৫)

অপরদিকে হরানন্দ যে কতো সদাশয় ও পরোপকারী, উদার ও সন্তানবৎসল ছিলেন তারও একাধিক নজীর এ বইতে মজুদ রয়েছে।

আত্মচরিতকার হিসেবে শিবনাথের মস্ত সৌভাগ্য এই যে, নানা রকম দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার অভিঘাত সারা জীবন বিচিত্র পথে এসে তাঁর মর্মে হানা দিয়েছে। সমাজ ও ইতিহাসের চোখে তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিকথা সাধারণ মানুষের পারিবারিক উত্থান-পতনের গ্লানি-বিপর্যয়ের শোনিত ধারায় উজ্জীবিত। যতখানি তা ব্যক্ত হোয়েছে, ততখানিই কীর্তিমান পুরুষ অন্তরংগ সুহৃদে পরিণত হোয়েছেন। শিবনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মনের কথা, দেহ-মনের কথা, তাঁর সাধ্যমতো বোলতে চেষ্টা কোরেছেন। স্বভাবগত 'আধ্যাত্মিক শুচিবাই'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কোরতে সমর্থ হননি বটে, কিন্তু প্রধান কীর্তি সমূহের মূল্যবান দলিলের ফাঁকে ফাঁকে মানবীয় বিকারের এই পরিমিত স্বীকারোক্তি ইতিহাসকে স্পৃহনীয় কোরে তুলেছে। বর্ণিত চরিত্রের মূলগত গৌরব তাতে কোথাও বিকৃত হয় নি, পাঠকের শ্রদ্ধাবোধ কখনো পীড়িত হয় নি। মীর সাহেবের জীবনেও রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনার অভাব ছিল না। আমার জীবনীর মুখ্য এবং একমাত্র অবলম্বনই হোলো মীর সাহেবের প্রথম প্রেমের মর্মান্তিক শোকাবহ অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার পটভূমি নির্দেশ, তার ঘনায়মান জটিলতার প্রস্তুতি, তার পরম মুহূর্তের ট্র্যাজেডির ব্যাখ্যান সবই এতটা উদ্দামতা, নাটকীয়তা ও অতিকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত যে তাকে সকল সময় ঠিক আত্মজীবনীর এখতেয়ারভুক্ত বলে মনে হয় না। রচনাকারীর জীবনের অপরিহার্য যশ খ্যাতি-দীপ্ত মহত্ব দৃশ্য অদৃশ্য সূত্রে হৃদয়ের গোপন লীলার সংগে আগাগোড়া গ্রথিত নয় বোলে, আবেদন অনেক ক্ষেত্রে নিছক শিহরণমূলক এবং উপন্যাসোচিত। মীর-মানসের একটি প্রধান ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হোয়েছে সপত্নীবাদকে কেন্দ্র কোরে। এই বিষবৃক্ষ যেন মীর পরিবারের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে হলেও শিবনাথের গার্হস্থ জীবনের বিক্ষোভের মূলেও জায়া। দুই পত্নী। প্রথম পত্নী যখন সম্ভবত অষ্টাদশবর্ষীয়া তন্বী তখন শিবনাথের পিতা কোনো কারণে পুত্রবধূকে জীবনের মতো তার পিতৃগৃহে নির্বাসিত রাখার সংকল্প নেন এবং শিবনাথকে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ কোরতে বাধ্য করেন। উভয়ের প্রতি নিজের আচরণে টানাপোড়েন, প্রচারিত অধ্যাত্ম আদর্শ ও মানবোচিত স্বভাবের বিপরীতমুখী

তাগাদায় জর্জর হোয়ে শিবনাথ অনেক নিঃসংগ বিনিদ্র রজনী যাপন কোরেছেন। তার কিছু কিছু কথা শিবনাথ বলেছেন সংকোচের সংগে, শংকার সংগে। অতি পরিমিত আকারে। অতি নিম্ন কণ্ঠে।

> আমার পত্নিদ্বয় ঘটিত যে সকল সংগ্রাম গিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহাকে (দুর্গামোহন দাস) অনেক কথা বলিলাম, এসকল বলিতে লজ্জা হয়। জগদীশ্বরের মহিমা! আমি অতি দুর্বল, তিনি আমাকে বিনয়ী রাখুন।[৩৪]

একুশ বৎসরের শিবনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুপত্নী মহালক্ষ্মীর সংগে নানা রকম পরামর্শের পর স্থির করেছিলেন

> যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১।১২ বৎসরের বালিকা। বোধ হয়, আমার পিতামাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। (পৃষ্ঠা ৭৯।)

পত্নীকে পুনর্বার বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

> "আমি কর্তব্যবোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম।...প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতাম গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাজমোহিনীর বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোনো ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়! তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মা গো! মেয়েমানুষের আবার কবার বিয়ে হয়! "তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। ...আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করিতে হইবে।
>
> কিন্তু আর একদিক দিয়া আমার আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী

অপরদিকে হরানন্দ যে কতো সদাশয় ও পরোপকারী, উদার ও সন্তানবৎসল ছিলেন তারও একাধিক নজীর এ বইতে মজুদ রয়েছে।

আত্মচরিতকার হিসেবে শিবনাথের মস্ত সৌভাগ্য এই যে, নানা রকম দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার অভিঘাত সারা জীবন বিচিত্র পথে এসে তাঁর মর্মে হানা দিয়েছে। সমাজ ও ইতিহাসের চোখে তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিকথা সাধারণ মানুষের পারিবারিক উত্থান-পতনের গ্লানি-বিপর্যয়ের শোনিত ধারায় উজ্জীবিত। যতখানি তা ব্যক্ত হোয়েছে, ততখানিই কীর্তিমান পুরুষ অন্তরংগ সুহৃদে পরিণত হোয়েছেন। শিবনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মনের কথা, দেহ-মনের কথা, তাঁর সাধ্যমতো বোলতে চেষ্টা কোরেছেন। স্বভাবগত 'আধ্যাত্মিক শুচিবাই'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কোরতে সমর্থ হননি বটে, কিন্তু প্রধান কীর্তি সমূহের মূল্যবান দলিলের ফাঁকে ফাঁকে মানবীয় বিকারের এই পরিমিত স্বীকারোক্তি ইতিহাসকে স্পৃহনীয় কোরে তুলেছে। বর্ণিত চরিত্রের মূলগত গৌরব তাতে কোথাও বিকৃত হয় নি, পাঠকের শ্রদ্ধাবোধ কখনো পীড়িত হয় নি। মীর সাহেবের জীবনেও রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনার অভাব ছিল না। আমার জীবনীর মুখ্য এবং একমাত্র অবলম্বনই হোলো মীর সাহেবের প্রথম প্রেমের মর্মান্তিক শোকাবহ অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার পটভূমি নির্দেশ, তার ঘনায়মান জটিলতার প্রস্তুতি, তার পরম মুহূর্তের ট্র্যাজেডির ব্যাখ্যান সবই এতটা উদ্দামতা, নাটকীয়তা ও অতিকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত যে তাকে সকল সময় ঠিক আত্মজীবনীর এখতেয়ারভুক্ত বলে মনে হয় না। রচনাকারীর জীবনের অপরিহার্য যশ খ্যাতি-দীপ্ত মহত্ব দৃশ্য অদৃশ্য সূত্রে হৃদয়ের গোপন লীলার সংগে আগাগোড়া গ্রথিত নয় বোলে, আবেদন অনেক ক্ষেত্রে নিছক শিহরণমূলক এবং উপন্যাসোচিত। মীর-মানসের একটি প্রধান ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হোয়েছে সপত্নীবাদকে কেন্দ্র কোরে। এই বিষবৃক্ষ যেন মীর পরিবারের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে হলেও শিবনাথের গার্হস্থ জীবনের বিক্ষোভের মূলেও জায়া। দুই পত্নী। প্রথম পত্নী যখন সম্ভবত অষ্টাদশবর্ষীয়া তন্বী তখন শিবনাথের পিতা কোনো কারণে পুত্রবধূকে জীবনের মতো তার পিতৃগৃহে নির্বাসিত রাখার সংকল্প নেন এবং শিবনাথকে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ কোরতে বাধ্য করেন। উভয়ের প্রতি নিজের আচরণে টানাপোড়েন, প্রচারিত অধ্যাত্ম আদর্শ ও মানবোচিত স্বভাবের বিপরীতমুখী

তাগাদায় জর্জ্জর হোয়ে শিবনাথ অনেক নিঃসংগ বিনিদ্র রজনী যাপন কোরেছেন। তার কিছু কিছু কথা শিবনাথ বলেছেন সংকোচের সংগে, শংকার সংগে। অতি পরিমিত আকারে। অতি নিম্ন কণ্ঠে।

> আমার পত্নিবিয়য় ঘটিত যে সকল সংগ্রাম গিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহাকে (দুর্গামোহন দাস) অনেক কথা বলিলাম, এসকল বলিতে লজ্জা হয়। জগদীশ্বরের মহিমা! আমি অতি দুর্বল, তিনি আমাকে বিনয়ী রাখুন।[৩৪]

একুশ বৎসরের শিবনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুপত্নী মহালক্ষ্মীর সংগে নানা রকম পরামর্শের পর স্থির করেছিলেন

> যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১।১২ বৎসরের বালিকা। বোধ হয়, আমার পিতামাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। (পৃষ্ঠা ৭৯।)

পত্নীকে পুনর্বার বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

> "আমি কর্তব্যবোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম।...প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতাম গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাজমোহিনীর বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোনো ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়! তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মা গো! মেয়েমানুষের আবার কবার বিয়ে হয়! "তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। ...আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করিতে হইবে।
>
> কিন্তু আর একদিক দিয়া আমার আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী

হইতেও সেই সময়ের জন্য আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সংগে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্বে হেমলতা, তরঙ্গিণী ও প্রিয়নাথ তিনজন জন্মিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে স্কুলঘর ও কেশববাবুর আপিস ঘর ভিন্ন অধিক বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নময়ীর ঘরে না শুইলে শুই কোথায়? দূরে গিয়া থাকা আমার পক্ষে সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ীর পক্ষেও তাহা অতীব ক্লেশকর হইল। অবশেষে প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া এখানে ওখানে শুইতে আরম্ভ করিলাম।...শুইবার স্থানাভাবে কলেজের বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজ-মোহিনী মনে করিলেন তিনি এই সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া ঘোরবিষাদে পতিত হইলেন, তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। (১১২-১১৩ পৃষ্ঠা)

আরো কিছুদিন পর :

একদিন কেশব বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার দুই পত্নীকে যেভাবে আশ্রমে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন, যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় ছিল না, কারণ আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নময়ী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও রাখা হইবে, আমি শনিবারে সেখানে আসিয়া রবিবার তাহার সঙ্গে যাপন করিব। ..

...বিরাজমোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিলেন না দেখিয়া এই স্থির করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন, তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদনুসারেই কার্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে বহু বৎসর এই প্রণালীতে কার্য চলিয়াছে। (পৃঃ ১১৮—১১৯)

তারপর আরো পরিণত বয়সে :

আমি কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিয়া পরিবারদিগকে সেখানে রাখিয়া কলিকাতার কর্মস্থানে আসিলাম। এই সময় হইতে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব নিয়মানুসারে তাঁহাদের উভয় হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেকদিন গিয়াছিল। (১৪০—১৪১)

অর্ধ শতাব্দী পরে আমাদের আধুনিক কালের অব্রাহ্ম পাঠক এই সংগ্রামের বিস্তৃততর ইতিহাস আরো অকুণ্ঠিত স্পষ্টতার সঙ্গে বিবৃত হোলনা বলে আক্ষেপ কোরতে পারেন কিন্তু অস্বীকার কোরতে পারবেন না যে, যা বর্ণিত হোয়েছে, তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় অপরিসীম।

বার

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩২০॥

বিপিন বিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ প্রধানত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মনের কথা। এই বই প্রকাশিত হবার পর আরো উনিশ কুড়ি বছর উনি বেঁচে ছিলেন। কৃষ্ণকমল মারা যান ইং ১৯৩২ এ, বিরানব্বুই বৎসর বয়সে। "তিনি ছিলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর, ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্রে তিনি কৃতবিদ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্র সমাজে পূজ্য ছিলেন। সকল খ্যাতির উপর ছিল তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার স্থান, তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সংকল্প, পরিমিতভাষী, তীক্ষ্ণধী পুরুষ জীবিতকালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগর থেকে শুরু কোরে দ্বিজেন ঠাকুর পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন কোনো স্বদেশী বিদেশী কৃতি পুরুষ নেই যাঁর সান্নিধ্য ও সংঘাত কর্ম বা চিন্তা ক্ষেত্রে তিনি তীব্র ভাবে উপলব্ধি না কোরেছেন। এই কারণে এই গ্রন্থে যে রীতিতে আত্মমানস বর্ণিত হয়েছে, যে রসে তা ভরে উঠেছে সেটা রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতের সংগে তুলনীয়। কৃষ্ণকমলের আত্মকাহিনী, বলা বাহুল্য, ব্যক্তি জীবনের কালানুক্রমিক অভিজ্ঞতার উদঘাটন নয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের সূত্র ধোরে আলোচনা প্রসংগে নিজের ও যুগের চিন্তার নানা উজ্জল ছবি তিনি এঁকেছেন। আশপাশের মানুষেরা রক্তমাংসের সজীবতা নিয়ে সেই তত্ত্বালোচনায় বাস্তব জীবননাট্যের প্রাণ সঞ্চারিত কোরেছে। পুরাতন প্রসঙ্গে এই জন্যে খুব সংগত কারণেই পুরাতন কালের বহু সংখ্যক মনীষীদের নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাকে সূচিপত্রের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যদিও কঁৎ ও মিলের জীবনচিন্তার অন্তরংগ বিশ্লেষণ কৃষ্ণকমলের জীবনদর্শনকেই ব্যক্ত কোরেছে, তবু আমরা এই গ্রন্থের যে সকল অংশ সমূহ পাঠ কোরে সবচেয়ে বেশী হৃদস্পন্দনের দ্রুতি অনুভব কোরি সে হোলো যেখানে লেখক নিজের ধ্যান ধারণার সংগে আমাদের অতি পরিচিত সেকালের কোন চিন্তানায়কের জীবনবোধের সম্পর্ক বিচার কোরেছেন। যেমন

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না, যাহারা জানিতেন তাঁহারা কিন্তু সে বিষয়ে লইয়া তাঁহার সংগে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস্য করিতেন, ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হা রে ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?" ললিত উত্তর দিতেন, "আছে বৈ কি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কার?" বিদ্যাসাগর হাসিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন আরব্ধ হয়, যখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল, যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের ধর্ম্মবিশ্বাস টলিল, চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমার এই পূর্ব্বস্মৃতি বিবৃতি করিতে বসিয়া যাহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল, কবি বিহারিলাল, জজ দ্বারকানাথ।.....

আমি Positivist, আমি নাস্তিক। যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসংগ বিবৃতির সূত্রপাত হয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে,—"কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক, he can write and he can fight, and he can slight all things devine (২২৮-২৩০ পৃষ্ঠা)

এই পর্য্যায়ের জীবন চিত্রণের মধ্যে কৃষ্ণকমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুনঃসৃষ্টি বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের জীবনাচরণ ও সাহিত্য-প্রীতি যে সমালোচনার ঊর্ধে নয়, এরকম কঠিন কথা সেকালে কেনো একালেও এত স্বল্পশ্রুত যে, এই অংশের আবেদন তীব্ররূপে চাঞ্চল্যকর না হোয়ে পারে না। কয়েকটি উদ্ধৃতি:

বিদ্যাসাগরের মুখের বুলি ও লেখার ভাষা:

কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্‌সনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মেকলে ডাঃ জন্‌সন সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinism ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমনকি বাংলা Slang শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া', (to be confounded), 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও', 'বিধঘুটে', 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সেদিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয় শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যা-সাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে, তিনিও সেই অর্থে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন, অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি সমারোহ ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না—ও কথার ও অর্থ হইতে পারে না, উহা একেবারেই ভুল।

একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপযোগ্যতা'। এই শব্দটি ন্যায় শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—Fitness per se। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়া-ছিলেন সেটি এই—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ! আমরা এক দেশের লোক, একজাত, এই শহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা করলেই পারতেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি, স্বদেশীর সঙ্গে আসা-যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।' অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই।

আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন—'এদিকে কথায় কথায় কোষ্ঠ-শুদ্ধি হোচ্চে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!' (পৃঃ ৪৭—৪৯)

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের পরশ্রীকাতরতা ঃ

বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্য গঠনে কি প্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে যেমন জগৎ-সংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে, নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের—আমাদের যে নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের,—এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত, তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল!

শ্যামচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, ল্যাটিন ও গ্রীক জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণ-কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাতে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবার-বিলাসিনীভুজংগঃ (the fancyman of eighteen courtezans of Languages)। শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন। শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল, কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।...

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী তর্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন।... বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে

মোটেই দেখিতে পারিতেন না, কেবল বলিতেন, 'লোকটার রকম দেখেছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।'

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরেজীতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—'ইংরাজী আমি যৎসামান্য জানি, যদি কিছু আমার জানা-শুনা থাকে তা সংস্কৃত শাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন—বাস্‌রে, ইংরাজীতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃতে এর কতই বিদ্যে আছে!' এইরূপ কোনও আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্ব্বোধও নেই, তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য, তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান, কিন্তু তোমাদিগকে নির্ব্বোধ এইজন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্ম্মণ্য অনেক ব্যাক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।' রাজেন্দ্রলালের বিবিধার্থ সংগ্রহ কোথায় ভাসিয়া গেল!

ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন,—সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাংলা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—'অক্ষয় লিখতে টিখতে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দুজনের style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (পৃঃ ৫০—৫৩)

বিদ্যাসাগরের খ্যাতির অপর পিঠ ঃ

বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত 'সাহেবদের' নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিসের মূল্য হয় না।

আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর সাহেবদের কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়। পূর্ব্বে আমি যে তাঁহার literary jealousyর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্ব্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। সাহেবদের নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না, তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে সাহেব সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে দাও। Mrs. Besant হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙ্গালী গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবি যখন হিন্দুর তীর্থস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া দিল, প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা প্রসব। (পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭)

কালীপ্রসন্ন, বংকিম, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সম্পর্কেও অনেক উল্লেখযোগ্য উক্তি এ বইতে রয়েছে। বিহারীলাল যে 'যাবজ্জীবন' 'দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়া দেহ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন' এবং 'সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালী জাতীর সেরূপ খুব কমই আছে'—একথাও বোলেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। (১৭৩ পৃষ্ঠা)

এই গ্রন্থের আরেকজন কথক হোলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। অভিনেতার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে তিনি অতি সংক্ষেপে (১২৫-১৬২ পৃষ্ঠা) বাংলা রংগমঞ্চের উন্মেষ ও বিকাশ ধারাকে জাজ্জ্বল্যমান কোরে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পুরাতন প্রসংগের লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত যদিও সকল প্রসংগের অন্তরালে আত্মগোপন কোরতে সক্ষম হোয়েছেন, তথাপি যেখানে তিনি স্বপ্রকাশ সেখানেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ভূমিকা অংশের কয়েক পৃষ্ঠায়, আত্মকাহিনীমূলক রচনা পাঠের উৎকণ্ঠা ও আনন্দের স্বরূপকে প্রসংগক্রমে হলেও অতি চমৎকাররূপে ব্যক্ত কোরেছেন :

কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এক একবার মাঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া একাগ্রভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে কি

হারাণর মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে বুঝিতে পার কি? একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার ষ্ট্রীটের যে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাস করিয়া ছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে মাটি তিনি নিজে কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখ্‌ড়া করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে গায়ে মাগিয়া কুস্তি করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে ত, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ সানবাঁধান হইয়াছে? সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো। গ্রীকপুরাণের অসুরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান্ হইবে, মাটি মাখো, মাটি মাখো। (১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

তের

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্রোহে বাঙ্গালী, কলিকাতা ১৯৫৭॥

বিদ্রোহে বাঙ্গালী গ্রন্থে বাংগালী সিপাহী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী বর্ণনা কোরেছেন। "সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে উপজীব্য করিয়া সেকালে যে কয়জন দেশীয় লেখক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাশীর সৈয়দ আহমদ খান, কানপুরের নানক চাঁদ, এলাহবাদের ভোলানাথ চন্দর এবং বাংলা দেশের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় বইটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কাল ১২৯৮ থেকে ১৩০৩। তখন রচনাটির নাম ছিলো আমার জীবন। নাম যাই থাক না কেনো গ্রন্থখানি আদৌ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র জীবনের ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের কালে যে সব বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনা দুর্গাদাসকে বিচলিত ও অভিভূত কোরেছে আশ্চর্য কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা ও পুংখানুপুংখতার সংগে এ বইতে তা বর্ণিত হোয়েছে।

আলোচ্য সংস্করণের (১৯৫৭ ইং) পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৮। ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিদ্রোহ-পূর্ব ও বিদ্রোহ-বহির্ভূত বিষয়ের বর্ণনা। দুর্গাদাসের সামাজিক পরিচয়, সেনাবাহিনীর গঠনপ্রকৃতি (পৃঃ ৫০-৬৩) এবং বাজার দর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য এই অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রসংগত বর্মা মুলুকের মগ (পৃঃ ২২-২৯) ও নাইনিতাল কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ নর্তকী সম্প্রদায় (রামজানি) সম্পর্কে (পৃঃ ৬৩) অনেক সূক্ষ্ম সরস ও অজানিত কথা বলা হোয়েছে। এর পর বিদ্রোহের কথা। আট সংখ্যক ইররেগুলার অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের হিসাবরক্ষকের চাকুরী নিয়ে দুর্গাদাস সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। রেজিমেণ্টের সংগে ১৮৫৭তে দুর্গাদাস যখন বেরিলীতে এসে পৌঁছুলেন তখন চারিদিকে আসন্ন বিদ্রোহের উত্তাপ ও উৎকণ্ঠা ভালোভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল। বিদ্রোহের প্রকৃত বিস্ফোরণ হোলো রবিবার, ৩১এ মে। এই বিদ্রোহে বিপর্যস্ত এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত, তার প্রবল আঘাতে চালিত ও তাড়িত দুর্গাদাস যেনো বিদ্রোহের এক ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অংগ। দুর্গাদাস বিদ্রোহের বাহ্য ঘটনাবলীকে অতি নিকট থেকে দেখেছেন, অতি নিকটে থাকার জন্যে তার বিষাগ্নির আঁচ এড়াতে পারেন নি এবং এই নৈকট্য তাঁর ইংরেজমুগ্ধ বীর হৃদয় এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না বোলেই বিদ্রোহের জটিলতম ঘটনাবর্ত ও তরংগাভিঘাতের সংগে অনিবার্যভাবে যুক্ত থেকে একাধিক ক্ষেত্রে তার মর্মদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্রোহের প্রথম দিবস বর্ণিত হয়েছে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তৃতীয় দিনের বর্ণনা শেষ হয়েছে ১২৩ পৃষ্ঠায়।১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চতুর্থ দিনের কথা। এমনি করে, ১৪ই জুন পর্যন্ত বেরিলীর মুসলিম সিপাহী ও অভিজাত নাগরিক, হিন্দু বেনে, শেঠ, সন্ন্যাসী, সৈনিক ও ইংরেজ শাসক সেনাপতিবর্গের দশা-দুর্দশার কথা দুর্গাদাস পরিণত চাতুর্যের সংগে লিপিবদ্ধ কোরেছেন। প্রাথমিক সাফল্যের পর বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ পর্বে ১৭০ পৃষ্ঠায় বইয়ের ১ম খণ্ড শেষ। বিদ্রোহী শিবির থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে দুর্গাদাস আগষ্ট মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত বেরিলীতে থাকেন। ৩১৪ পৃষ্ঠায় দুর্গাদাস বর্ণনা কোরেছেন কি কোরে একের পর এক বিপদ অতিক্রম কোরে অবশেষে তিনি ইংরেজ শিবির নাইনিতালে গিয়ে পৌঁছুলেন। গ্রন্থের বাকী অংশে ইংরেজের কথা। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হোয়েও তাঁরা যে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন,

ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় কোরে কৌশলে বিদ্রোহীদের পরাজিত কোরেছেন, তার কাহিনী দুর্গাদাস দরদ দিয়ে বোলেছেন। বিদ্রোহ দমিত, গ্রন্থও সমাপ্ত। কাহিনীকারের শেষ বাণী ঃ

> আবার বেরিলীতে ইংরেজের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। কিন্তু আর না। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট জীবনী আর লিখিবার উপযুক্ত নহে। (পৃঃ ৪১৮)

দুর্গাদাস প্রভুভক্ত ইংরেজ ভৃত্য। স্বভাবতই তাঁর বর্ণনায় ইংরেজ প্রীতি ও ইংরেজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে লজ্জাহীন। তবু প্রশংসার বিষয় এই যে, দুর্গাদাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। বেরিলির ফজলুল হককে গুণ্ডা ও বদমায়েশ বলেছেন বটে (পৃঃ ১১৪), কিন্তু পরে তাঁর যে জীবন বৃত্তান্ত পেশ কোরেছেন তা থেকে আমরা স্বতন্ত্র সীদ্ধান্তেও পৌঁছুতে পারি (পৃঃ ১৭৬)। বিদ্রোহী সেনাবাহিনীদের উন্মাদনাকে ঘৃণ্যবর্ণে চিত্রিত কোরেও স্বীকার করেছেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (পৃঃ ১৬৯, ১০০)। বেরিলিতে বিদ্রোহীরা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যে সকল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাতে হিন্দু ধনপতি ও রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কোরেছিলেন। ইংরেজের দাস দুর্গাদাস যে সর্বত্র সিপাহীর আন্দোলনকে নিছক মুসলিম সিপাহী ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর হেয় ষড়যন্ত্ররূপে বিচার করেন নি, তাঁর পক্ষে এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়! দুর্গাদাসের মানস-প্রকৃতি ছিল নাগরিক, সৌখিন, মজলিসী। নিজের অবশ্যকরণীয় নওকরী ছাড়াও তিনি নর্তকীর কদর কোরতে জানতেন, নানারকম সংগীতের রসজ্ঞ সমজদার ছিলেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে কলাবিলাসী নাগরিকদের আদর আপ্যায়নে তুষ্ট রাখতেন। হিন্দু বাংগালী সিপাহী এতো ষোল আনা ইংরেজের গোলাম হওয়া সত্ত্বেও জীবনের বিচিত্র রসের পিপাসা ও আস্বাদন দুর্গাদাসের রোজনামচাকে সর্বজন-পাঠ্য সাহিত্য-কর্মের মর্যাদা দান কোরেছে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা, গোলা বারুদের বিস্ফোরণ ও রণনীতির নিষ্ঠুরতার অন্তরালে যে সকল মানবিক দ্বন্দ্বশঙ্কা, প্রেম-উৎকণ্ঠা স্বতন্ত্র নিয়মে ক্রিয়াশীল ছিলো তার অপকট স্বীকারোক্তিও এখানে একাধিকবার লক্ষণীয়।

দুর্গাদাস বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা কোরতে অস্বীকার করায় "বখ্‌ত খাঁ যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, 'ইংরেজ আওর

বাঙ্গালী সব এক হ্যায়। তুমকো নেহি মালুম হ্যায়, কি, হাম আভি তুমারা গরদান কাটনেকো হুকুম দে সকতে হেঁ। নিমক হারাম! বেইমান! হাজার রূপেয়া তন্‌খা ভি কবুল নেহি করতা? খুব মালুম হ্যায় কি ইংরেজকা সাথ তুমহারী সাজিস হ্যায়।'' (পৃঃ ৯৪) কিন্তু বিদ্রোহী সেনাদলের দ্বিতীয় অধিনায়ক মহম্মদ সফী নিজের ব্যক্তিগত ওয়াদা রক্ষা কোরতে তবু পশ্চাদপদ হন নি। তাঁর কল্যাণে দুর্গাদাসকে সাধারণ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হোল না। বিদ্রোহী সৈনিকদের পর্যন্ত যা জোটে নি সেই আটা, ঘি, হিন্দু-রক্ষী মারফৎ লাভ কোরলেন। মহম্মদ সফীর সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে পলায়নে পর্যন্ত সমর্থ হোলেন। এরকম একবার নয় কয়েকবার ঘটেছে। নাইনিতালে ইংরেজের সংগে মিলিত হওয়ার প্রাক্কালে আরেকবার তিনি হলদোয়ানিতে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়েন।

> পূর্বোক্ত সর্দ্দারের আর দুইজন সওয়ার আমাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফজল হকের সম্মুখে সমানীত করিয়া সকল বৃত্তান্ত একে একে বিবৃত করিল। তিনি কোন কথার উত্তর করিলেন না। কেননা, তখন তিনি জানু পাতিয়া মালা হস্তে 'ওজিফা' পড়িতে ছিলেন। তাহারা আমাকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৌলবী ওজিফা সমাপ্ত করতঃ দুইটি হস্ত একবার আপনার মুখে দিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে আরক্ত-লোচন, সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল। কিন্তু ব্যাকুলতা বা অধীরতা স্বীকার করিলাম না। মৌলবী অতি পরুষ এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—'তু কোন হ্যায়?' আমি ইতিপূর্বে বিদ্রোহী সৈন্যদের নিকট যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, এখানে তাহাই বলিলাম। কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, 'তুঁ আপনে তঁই চাপরাশী বানাতা হ্যায়—সব ঝুঁটা বাত হায়, চাপরাশীকা গুপ্তগু এইসী সলিব নেহী হোতী হ্যায়। তুঁ কাফরোঁকো রসদ পোঁহুতা হ্যায়। লে অব উসকা মজা চখ্।' এই বলিয়া সর্দ্দারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'ইসকো কল ফজর তোপমে উড়া দেও।' (পৃঃ ২১৯)

সে রাতেও মুসলমানস্পৃষ্ট পানি পান করতে অস্বীকার করায় হিন্দু বাহকের হাত দিয়ে দুধ জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। 'বুঝিলাম সত্য সত্যই মুসলমানের আমার উপর দয়া হইয়াছে।' (পৃঃ ২২৫) পরদিন সকালে

> আমি যে স্থলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলাম, সেই স্থলে নবাব সাহেব দুই জন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন। তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে উত্তম রূপ দেখিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এক জন প্রহরী আমার বন্ধন শিকলসমূহ শিথিল করিয়া ভীমরবে কহিল 'খাড়া হো যাও।' আমার ওষ্ঠাগতপ্রাণ, উত্থানশক্তি এক রকম রহিত। কিন্তু কি করি, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম এই বুঝি তোপে উড়াইবার বা নাসা কর্ণচ্ছেদের হুকুম হইল। দুর্গতিনাশিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর নাম কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই নবাব—সেই গভর্ণর—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আমাকে মধুর রবে তখন জিজ্ঞাসিলেন, 'বাবু সাহেব! আপ হিয়া ক্যায়সে আয়ে?'··· (পৃঃ ২২৬)

তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষুকোণে জল আসিল। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। ক্রমশঃ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সৌম্যমূর্ত্তি নবাবসাহেব ধীরে ধীরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, 'বাবু সাহেব! কাঁদিবেন না, বড়ই সংকট কাল। চোখের জল শীঘ্র মুছিয়া ফেলুন। কি হইয়াছে, কি ঘটিয়াছে, আমাকে সংক্ষেপে শীঘ্র বলুন।' আমি মৌলবী ফজল হকের নিকট চাপরাশী বলিয়া যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, সেই কথা বলিলাম এবং পথের অন্যান্য সকল সংবাদ তাঁহাকে কহিলাম। শেষে অতি বিনীতভাবে জানাইলাম, আমাকে এ যাত্রা আপনি রক্ষা করুন।

নবাব সাহেব আমাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'বাবু সাহেব! পহিলে মেরা গরদান হোই কাটেগা, পিছে আপ্‌কা। আপ্‌ কুছ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।' অন্য কেহ শুনিতে না পায়, এরূপ অনুচ্চস্বরে তিনি আমাকে এই কথাগুলি বলিলেন।··· (পৃঃ ২২৭।)

সেই চুন্না মিয়া আমার নিকট হইতে অতি দ্রুতপদে মৌলবী ফজল হকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, 'আমি ঐ বাবুকে চিনি, ঐ ব্যক্তি ভাল মানুষ, বেরিলিতে চাপরাশীর কাজ করিত এবং সংগতিপন্ন ছিল। উহার ভ্রাতা নাইনিতালে আছে, ইহা আমি জানি। তাই ও ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে যাইতেছিল। রসদ পৌঁছিবার সংগে উহার কোন সম্পর্ক নাই। এ ব্যক্তি বিশ্বাসী এবং মুসলমান রাজ্যের মংগলাকাংক্ষী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।' এইরূপ নানা কথা চুন্না মিঞা ফজল হককে বুঝাইয়া বলিলে, ফজল হক কহিলেন, 'হুজুর! আপ মালিক হ্যায় যো আপ জানতেহেঁ তো ঝোড় দিজিয়ে।'··· (পৃঃ ২২৮)

আমার সেবার জন্য চুন্না মিয়া চারি জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা বাজার হইতে নববস্ত্র আনিয়া দিল। আমি স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলাম।

> দেখিতে দেখিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, চাল, ডাল, আলু, আটা ও অন্যান্য মসলাসমূহ আনীত হইল। মাটির উনান তৈয়ারি হইল।
>
> বলা বাহুল্য, আমার মুক্তির সংগে সংগে আমার প্রার্থনানুসারে টাটুওয়ালা ও সেই নবীন হিন্দুস্থানী যুবকেরও মুক্তিলাভ হয়। (পৃঃ ২৩১)

মুক্তিলাভ কোরে দুর্গাদাস ইংরেজদের সংগে যোগ দেন এবং বিদ্রোহ দমনে এক বিশিষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি বা বদান্যতামূলক রণনীতিবিরুদ্ধ আচরণ ছাড়াও বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর দুর্বলতার ও ব্যর্থতার অনেকগুলো কারণ দুর্গাদাস গ্রন্থের নানা স্থলে উল্লেখ কোরেছেন। ক্ষমতালাভের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ব্যাপক বিশৃংখলা সেগুলোর মধ্যে প্রধান। যে অভিজাত শক্তি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণে তৎপরতা প্রকাশ করেন তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল মধ্যযুগীয়, নেতিবাচক। তাঁদের চারিত্রিক সত্তাও ছিল মজ্জাহীন। হলদোয়ানি-নাইনিতালের চরম সংগ্রামে বিদ্রোহীদল যে আত্মঘাতী অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দেয় তা বর্ণনা কোরতে গিয়ে লেখক বলেন ঃ

> এই সময় আট দশটি তোপ, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং আড়াই সহস্র পদাতি সৈন্য লইয়া বিদ্রোহিগণ যদি নাইনিতাল আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহাদের নাইনিতাল করগতলগত হইত। ইংরেজ একটি মাত্র গোর্খা পল্টন লইয়া কিছুতেই তখন নাইনিতাল রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ, বেরিলি হইতে প্রায় এগার হাজার সৈন্য নৈনিতাল আক্রমণার্থ পাঠাইয়াছেন। তাহারা কিন্তু হলদোয়ানি প্রভৃতি নানা স্থানে অড্ডা করিয়া বসিয়া আছে, কেবল শুভকালের প্রতীক্ষা করিতেছে। ... এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডায়, আলস্যে এবং উপেক্ষায় দিন কাটিতে নাইনিতাল আক্রমণ আর করা হইল না। (পৃঃ ৩২২)

রসদের অপ্রাচুর্য, পাহাড়ীয়া অঞ্চলের সুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে সৈনিকদের মধ্যে হল্লা রেশারেশি, নেতৃবৃন্দের অন্যান্য দুর্বলতার সংঙ্গে যুক্ত হোয়ে, এই এলাকার বিদ্রোহীদের পতন আশু এবং অনিবার্য কোরে তুললো।

বিদ্রোহে বাংগালীর আবেদন মূলতঃ রোমাঞ্চকর। কি কোরে বাংগালী সিপাহী দুর্গাদাস বিদ্রোহের কবলে পড়ে বাড়ি ঘোড়া টাকা হারালেন (পৃঃ ৬৯-৭৮), বন্দী হলেন, মৃত্যুর দণ্ডাদেশে বধ্যভূমিতে নীত হয়েও মুক্তি পেলেন, পলায়নের পথে ঘোর নিশাকালে ভয়ানক অরণ্যে দিশাহারা হলেন (পৃঃ ২৪২-২৬৩),

ইংরেজ অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালনার ভার পেলেন, বিদ্রোহিদের নির্মম ভাবে নিশ্চিহ্ন কোরে দিলেন—এসকল লোমহর্ষক কথাই এই বইতে বর্ণময় রূপ লাভ কোরেছে। এই শিহরণমূলক কাহিনীর বুনটের ফাঁকে ফাঁকে দুর্গাদাস যে অপরিচিত জগতের মানুষ ও আচরণের প্রাণপুষ্ট স্মৃতিচিত্র এঁকে গেছেন বাংলা সাহিত্যে তার সমগোত্রীয় দৃষ্টান্ত বিরল।

নিছক সিপাহী বিদ্রোহের আলেখ্য হিসেবেও বইটি মূল্যবান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাংগালী হিন্দু সিপাহী বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নেকনজরে দেখতে পারে নি। এর মধ্যযুগীয়তা তাকে স্বাধীনতার এই প্রবল বিক্ষোভ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হোতে দেয় নি। মুসলিম শাসন সম্পর্কে বৈরীভাব ও তুলনায় পাশ্চাত্য শাসকবর্গ সম্পর্কে মোহ বিদ্রোহ প্রসংগে তাকে ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হোতে দেয় নি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে মিউটিনী সম্পর্কে মাত্র সাড়ে তিন লাইন লিখেছেন ঃ

> জেলিয়াপাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সালে মিউটিনি ঘটে, এবং আমাদের কলেজ পটলডাংগা হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবাজার রোডের তিনটি বাড়িতে থাকে। মিউটিনী থামিলেও ঐ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপরে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে। (পৃঃ ৩৫-৪৩)

রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা কোরেছেন। ইংরেজ এবং ইংরেজাশ্রিত হিন্দু নগরবাসী বিদ্রোহের বিস্ফোরণে কি পরিমাণ আতংকিত ও জ্ঞানহারা হোয়ে পড়েন উভয় গ্রন্থকারই তা সকৌতুকে বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনার পেছনে ইংরেজের প্রতি বক্র অনুকম্পা যেমন স্পষ্ট তেমনি বিদ্রোহিদের প্রতি অবিশ্বাসও দৃঢ়মূল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংগালী বুদ্ধিজীবীর জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিচিত্র পর্যায়ে জাতিবৈরিতা কি অনুপাতে মিশ্রিত ছিল তার স্বরূপ নির্ণয়ে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা রচনামাত্রেই বিশেষ সাহায্য করবে। বিদ্রোহে বাংগালী যে এ ক্ষেত্রে এক অতি প্রামাণ্য এবং বিস্তৃত দলিলরূপে গৃহীত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুর্গাদাস তাঁর আশপাশের নাগরিক ও সামরিক জীবনের গঠনপ্রকৃতি যে রীতিতে ব্যাখ্যা কোরেছেন তার সূক্ষ্মতা ও পুংখানুপুংখতার তারিফ অন্যত্র কোরেছি। তৎকালীন বাজার দর ও দুর্গাদাসের নিজস্ব ধন দৌলতের সংকেত বহনকারী একটি মাত্র দীর্ঘ উদ্ধৃতি নজীর হিসেবে পেশ কোরে বিদ্রোহে বাংগালীর বর্ণনা শেষ কোরব।

আমার বাটীতে মা-কালীর নামে প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগ বলিদান হইত। দুই সের করিয়া মাছের বরাদ্দ ছিল। ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মাখন—এ সকল ঢালাও ছিল। খাইতাম আমরা দুই ভাই। এত বড়-মানুষি সত্ত্বেও যে মাসিক খরচ খুব বেশী হইত, তাহা নহে। তখন বেরিলিতে একশত সিক্কার ওজনে এক টাকায় আড়াই সের ভাল ঘৃত পাওয়া যাইত। আমার চাউল আসিত অতি উৎকৃষ্ট। পিলিভিটের নিউরিয়া নামক এক স্থান আছে, তথাকার চাউল প্রসিদ্ধ। মিহি চাউল লম্বা লম্বা দানা। সম্মুখে সেই চালের ভাত বাড়িয়া দিলে মল্লিকা ফুলের সুগন্ধে যেন সে স্থান আমোদিত করিত। সেই চালের মণ ছিল ৩৷৷০ টাকা। এখন সে চাল ১২৲ টাকা মণেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রাশি চাল ১৷৷০ টাকা বা ২৲ টাকা মণ ছিল। উৎকৃষ্ট আটা ১৲ টাকায় ৩২ সের পাওয়া যাইত। খাঁটী দুধ টাকায় ৩০ সের। বাজারে দুধ (মহিষের) এক পয়সা সের। হিন্দুস্থানীরা মাছ-মাংস বড় অধিক খাইত না। বেরিলির মুসলমানগণ মাছ-মাংসের বিশেষ ভক্ত। মাছের সের /০. কখন ৵০। রুই, কাতলা, পুঁটি মাছ মিলিত। পাঁঠা একটার মূল্য ৷৷০ হইতে ১৲ টাকা।... ভাল আম চারি আনায় বা পাঁচ আনায় একশত। খুব খাস আম আট আনা শয়ের উর্দ্ধে কৈ আমি কখনও দেখি নাই। (পৃঃ ৪৩)

বেরিলিতে যখন আমি আসি, তখন আমার হাতে মজুদ প্রায় ৩২ হাজার টাকা। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ৭৫৲ টাকা মূল্যে এক লৌহ-সিন্দুক কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেই সিন্দুকের ভিতর বেরিলির বাসায় আমার টাকা থাকিত। মোহর, টাকা, নোট এই তিন রকমে ৩২ হাজার টাকা ছিল। তখন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার প্রথা তত প্রবল ছিল না, কোম্পানীর কাগজের সুদ অতি কম বলিয়া আমি ঐ টাকায় কোম্পানীর কাগজ কিনি নাই। নগদ টাকা তোড়াবন্দী করা সিন্দুকে থাকিত। (পৃঃ ৪৫)

ব্রহ্মদেশে সর্ব্বরকমে আমার মাসিক কিছু কম চারি শত টাকা মাহিনা ছিল। ব্রহ্মদেশে আমার এক পয়সাও খরচ ছিল না। মাহিনার টাকা সমস্তই জমিত। (পৃঃ ৪৫) ব্রহ্মদেশ হইতে আমি প্রায় বার হাজার টাকা আনিয়াছিলাম।... বেরিলিতে তখন আমার মাসিক মাহিনা ছিল ১৬৫৲ টাকা (পৃঃ ৪৬)। আমার নিকট যে ৩২ হাজার টাকা ছিল, তন্মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ধার দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।... অনিচ্ছাসত্ত্বেও এরূপভাবে ধার দেওয়ায় আমার লোকসান কিছু ছিল না। আমি মাসিক প্রায় আট-নয় শত টাকা সুদ পাইতে লাগিলাম। সকলেরই নিকট মান্য ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইলাম। (পৃঃ ৫০)

চোদ্দ

ডঃ জনসন মনে কোরতেন যে কেবলমাত্র স্বরচিত হোলেই তাকে আদর্শ জীবনচরিত বলা যেতে পারে। অন্যথায় ত্রুটী বিচ্যুতির অশেষ সম্ভাবনা। কারণ কারো জীবনচরিত রচনা করা মানে সে ব্যক্তির কর্ম-জীবনের নানা ঘটনা ও কীর্তিসমূহের একটা খানাতল্লাসীমূলক অতি দীর্ঘ ক্লান্তিকর তালিকা তৈরী করা নয়। জীবনচরিত তাহলে সাহিত্যের অঙ্গ না হয়ে সমাজবিজ্ঞানের ভূষণ বোলে বিবেচিত হোতো এবং কেবল সত্যাসত্যের বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডেই তার মূল্য নিরূপণ করা যেতো। সেরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে কারো জীবন বর্ণিত হয় নি তা নয়।

> কোনো কোনো জীবনচরিতকার তাঁদের গ্রন্থে কেবল তথ্য জড়ো কোরে গেছেন। তাও এমন জাতের যা সাধারণের অধিগম্য দলিল দস্তাবেজ থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারতো। তাঁরা কেবল ব্যক্তির কীর্তিকলাপের কালানুক্রমিক তালিকাই প্রস্তুত কোরেছেন, জীবনী রচনা করেন নি। নায়কের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও আচরণ সম্পর্কে এতই ঔদাসীন্য প্রকাশ কোরেছেন যে, লেখকের সকল শ্রম ও পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার না কোরেও আমরা বোলতে পারি যে এই বংশ-পদবী জন্ম-মৃত্যুর নির্ভুল তারিখ তথ্য সম্বলিত বিপুল গ্রন্থটি পাঠ করার পরিবর্তে যদি আমরা বর্ণিত চরিত্রের ভৃত্যের সঙ্গে ক্ষণকাল আলাপ করার সুযোগ পেতাম তাহলে সে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় অনেক বেশী পরিমাণে জানতে পারতাম।[৩৬]

আমরা সাহিত্য-বিচারে এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখ অহেতুক মনে করি। "জীবনী-কারের কাজ হোলো যে সকল কর্ম ও কীর্তি ব্যক্তির স্থূল গৌরবের কারণস্বরূপ সেগুলোর উপর স্বল্প গুরুত্ব আরোপ করা। সদর এলাকা ত্যাগ কোরে প্রবেশ কোরতে হবে অন্দর মহলে, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের গোপনতম কন্দরে। প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র সহজ আচরণের ক্ষুদ্রতম ঐশ্বর্যকেও অনাবৃত কোরে উপস্থিত কোরতে হবে ব্যক্তিকে—যেখানে অন্যের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা শুধুমাত্র মানবোচিত ক্ষমতায় ও দুর্বলতায়।"[৩৭] ব্যক্তিসত্তার এমন হার্দ্য উদঘাটন অন্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া দুরূহ। অথচ একাজটি সুসিদ্ধ না হোলে জীবনী-পাঠের আসল আনন্দই মাটি।

> জীবনচরিতে বর্ণিত মহৎ জীবনের ভিত্তিভূমিতে পাঠক যখন এমন মানবীয় ভাব ও কর্মের সন্ধান পায় যার সঙ্গে তার মতো সাধারণ সামাজিকও একাত্মবোধ করতে পারে, তখনই সে আনন্দ লাভ করে। অন্য কোনো শ্রেণীর রচনাই পাঠকের চেতনাকে এত দ্রুত সজাগ কোরে তোলে না, এত মুগ্ধ কোরে রাখে না, এত অনুকরণসাধ্য আদর্শের দ্বারা সংক্রামিত করে না। বাইরের বসন ভূষণ, ভাগ্যচক্রে লাভ করা যশ প্রতিপত্তি-এগুলো থেকে আলাদা কোরে মানুষকে বিচার কোরলে দেখা যাবে যে তার অনেক ভালোমন্দো গুণাগুণ অন্য কারো থেকে স্বতন্ত্র নয়। . একই বাসনার দ্বারা আমরা চালিত, একই মোহে আচ্ছন্ন, একই আশায় উদ্দীপ্ত, বিপদে বিচলিত, কামনায় বিজড়িত, আনন্দে বিভোর।[৩৮]

মূলতঃ জীবনচরিত ও আত্মজীবনীর শিল্পরূপ একই রসের আবেদনকে মূর্ত কোরে তুলতে প্রয়াসী। সংজ্ঞানুসারেও আত্মচরিত হোলো স্বরচিত জীবনচরিত।[৩৯] বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ নিজেই নিজের বইয়ের নামকরণ করেন বিদ্যাসাগর চরিত। স্বরচিত। জীবনী ও আত্মজীবনী উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্ট চরিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে তা কতোটা তীব্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভ কোরেছে, জন্মমৃত্যুর বন্ধনীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অন্তহীন রহস্য মহনীয়রূপে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত হোয়ে উঠেছে। নাটক নভেলে সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য শুধু এই যে শিল্পীর কলারীতির বিনোদন যে মোহই বিস্তার করুক না কেন, পাঠকের এ বিশ্বাস অটুট থাকা চাই যে কল্পনাহীন বাস্তবই এখানে সার্বভৌম।

এই প্রসংগে পাঠকের আরো একটি দাবী বিচারযোগ্য। জীবনী বা আত্মজীবনীতে শিল্পরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তি চরিত্রটির কি সামাজিক ও লৌকিক সত্য হিসেবেও মূল্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়? যদি তিনি ইতিহাসের কোনো সুবিদিত মহৎ ও স্মরণীয় পুরুষ হন, মনে হয় যেন, আত্মচরিতকারের পক্ষে তাহলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে প্রত্যাশিত আনন্দ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পাঠক যেন আগে থেকে খালি আসন হৃদয়ে প্রসারিত কোরে রেখেছেন, মনের মানুষ মনের মতো করে এখন দখল চাইলেই অলঙ্কৃত ও উল্লসিত বোধ কোরবেন।

জীবনী ও আত্মজীবনীর মধ্যে যে অনৈক্য তা প্রধানতঃ রূপগত, ধর্মগত নয়। জীবনচরিতে লেখকের নিজস্ব ধ্যানধারণার অতিপ্রক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। লেখকের নিজের জীবনের প্রিয় বিশ্বাসের অনুমোদন অনুসন্ধান ও তার প্রতিফলন আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক সারবান জীবনালেখ্যকে

একপেশে অনির্ভরযোগ্য চিত্রে পরিণত কোরেছে। কিন্তু আত্মজীবনীতে লেখকের নিতান্ত নিজস্ব কাম ক্রোধ, প্রেম প্রীতি, সংস্কার বিশ্বাস, সাধনা সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া কর্ম সবই অতি অন্তরংগ রূপে বর্ণনীয়। যত তিনি ব্যক্তিগত হবেন, রচনায় শুধু মাত্র নিজেকে ব্যক্ত কোরবেন, নিজের চিত্ত ও চরিত্রের গূঢ় মর্ম প্রকাশে সক্ষম হবেন, নিজের বিদিত সত্তার বিকাশ যে সকল তুচ্ছ মহৎ ঘটনাবস্তুর অধীন ছিল তার বর্ণনা শোভন ও তাৎপর্যপূর্ণ রূপে কোরতে পারবেন ততই অটোবায়োগ্রাফিটি চমৎকারিত্ব লাভ করবে।

পত্তের

বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়দের প্রকৃত জীবন তাঁদের আত্মজীবনীসমূহকে শিল্পকর্মনিরপেক্ষ হৃদয়গ্রাহিতায় ভরে রেখেছে। রাসসুন্দরী দাসীর আত্মকাহিনী সে মহিমার সুযোগ গ্রহণে অপারগ। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কর্মজীবন তুচ্ছ ও নগণ্য না হলেও তুলনায় বিবর্ণ। মীর মশাররফ হোসেন সমকালীন জীবনবোধের কোনো প্রধান ধারাকে সূচিত বা নিয়ন্ত্রিত কোরবার অবকাশ পান নি। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনের যে নবীন উৎকণ্ঠা ভাবে ও কর্মে শিক্ষিত বাঙালীর নাগরিক জীবনকে চঞ্চল কোরে তুলেছিল তার সান্নিধ্য বর্জন কোরে মীর সাহেব আজীবন মফস্বলে কাটিয়েছেন। নতুন যুগের নির্মাণকারী সহযোগী অপরাপর ব্যক্তিবর্গের কথা যতো অবলীলাক্রমে রাজনারায়ণ বসু কি শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের আত্মকথায় উল্লেখ কোরেছেন মীর সাহেবের তা সাধ্যাতীত ছিল। তাঁর আমার জীবনীর কথাবস্তুর লৌকিক পরিমণ্ডলটি দেশের হিন্দু-মুসলিম মানসের বিবর্তন বৃত্তে কোনো অসাধারণ গৌরবের দাবীদার নয়। আমার জীবনীর শিল্পমর্যাদা কোনো অকল্পিত, সুপ্রচারিত কর্মরাশির পটভূমিতে বিকাশ লাভ করে নি। এ এক প্রকার নিরবলম্ব একক সত্তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার রোজনামচা মাত্র, বর্ণনার কৌশলে যতটা কলামণ্ডিত হোতে পেরেছে ততটাই আমাদের চিত্ত জয় করেছে। মীরের সার্থকতা জনৈক ব্যক্তির 'মনের কথা' প্রকাশ করায়। মীর সাহেব তার দক্ষ কারিগর। অন্দর মহলের কথা তিনি জানেন এবং বোলতে জানেন। কিন্তু এ অন্দরমহলের সদর এলাকায় আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত ভাব ও ব্যক্তিত্বের দ্যুতি অনুজ্জ্বল, দুর্নিলক্ষ্য।

ষোল

একটি একেবারে মৌল প্রশ্ন আমরা এযাবৎ এড়িয়ে গেছি। আমার জীবনীতে মীর সাহেব মনের কথা খুলে বোলবেন বোলে ওয়াদা করেছিলেন বটে কিন্তু আমরা পাঠশেষে প্রশ্ন না কোরে পারি না: সত্য সত্য কি 'মনের কথা' প্রকাশ লাভ কোরেছে? স্বরচিত বোলেই কি সরল অর্থে সকল আত্মজীবনী লেখকের আত্মসাক্ষাৎকারের প্রামাণ্য দলিল বোলে গৃহীত হবে? ডঃ জনসন অবশ্য অনেক আশা নিয়ে বোলেছিলেন যে, "জীবনচরিত স্বরচিত হলেই তা সম্পূর্ণ সত্যমূলক হওয়া সম্ভব।" আমরা সংশয়বাদী। রচনাকারী হয়তো সত্য-কথনে কুণ্ঠিত নন। নিজের চিত্ত ও কর্ম ব্যাখ্যা করার মানসিকতাও হয়তো তাঁর আছে। কিন্তু সত্তার সার প্রকাশ করা, নিপুণভাবে তাকে ব্যক্ত করা শিল্পকর্ম হিসেবেই ক্ষমতাসাপেক্ষ। এক আধজন প্রতিভাবান আত্মচরিত লেখক হয়তো একটা প্রশংসনীয় নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বমানস বিচারে ও বিশ্লেষণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু অপরের জীবনবৃত্ত রচনায় জীবনীকার যে শবচ্ছেদকারীর নির্বিকারত্ব নিয়ে পুরাতন তথ্যের স্তূপের মধ্যে সত্যানুসন্ধান করে বেড়াতে পারেন, নিজের জীবনের গোপন-অগোপন, উঁচু-নীচু গ্লানি-গর্ব সম্পর্কে সেরকম অকুণ্ঠিত বেপরোয়া মনোভাব শতেকে একজনের মধ্যে মিলতে পারে। নিকলসন সাহেবের মতে এখন পর্যন্ত সে প্রতিভা জন্মগ্রহণ করে নি।[৪০]

ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ কোরে আদালতের কাঠগড়ায় যে সাক্ষ্যদান করা হয়, উকীল মাত্রেই জানেন যে, তা অকাট্য সত্য নয়। লেখকের জবানবন্দীও মিশ্রিত সত্য মাত্র। সত্যভাষণের নানা স্তরে আত্মজীবনীকারের প্রকাশব্যগ্র চেতনা সঞ্চরণশীল। তার মধ্য থেকে নির্জলা লৌকিক সত্যটি উদ্ধার কোরতে হোলে অনেক সময় বিস্তর পরিশ্রম কোরতে হয়। বিচিত্র উৎস থেকে আহরিত বাহ্য প্রমাণ ও আন্তর নজীর সমূহকে পরস্পরের আলোতে পরখ কোরে তারপর আমরা এক একটি গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে পারি। মীর মশাররফ হোসেনের জীবন সম্পর্কে যে সকল বৃত্তান্ত মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন পত্রিকা-পুস্তকে প্রকাশিত হোতে দেখেছি তার অনেক কথাই কোনো বিশুদ্ধ বিচারের ফল নয়, হয় নিছক অনুমান, নাহয় সরল চিত্তে গৃহীত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত মীরেরই কোনো উক্তি।

মীর সাহেব তাঁর শেষ বয়সে রচিত এই আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম প্রণয়ের ওপর যে নাটকীয়তা ও রোমান্স রস আরোপ কোরেছেন তা সর্বত্র পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করে না। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে এই প্রেমের ব্যর্থ পরিণতির বর্ণনা। অনেক ক্ষেত্রেই তা উপন্যাসে চিত্রিত হৃদয় লীলার কাহিনীর মতো সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য। এই কাহিনী রচনায় মীর সাহেবের একটা বড় কৃতিত্ব এই যে, মূল পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনাচ্ছলে কোথাও নিজেকে তিনি প্রমাণ মাপের মানুষের চেয়ে বৃহদায়তন কোরে আঁকেন নি। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর প্রিয়তমা যখন নিশ্চিন্ত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে—সেই অন্তিম চিত্র রচনার কালেও মীর মশাররফ ঝাঁড়ফুঁক তুড়মী ইত্যাদি বাজীকরী বিদ্যায় নিজের পারদর্শিতা ঘোষণায় একটুও নিম্নকণ্ঠ বা পরিমিতবাক নন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রখর প্রেমের দীপালোকে যে চরিত্রটি এই গ্রন্থে ঝলমল কোরে উঠেছে তিনি মানব নন, মানবী ; মীর মশাররফ হোসেন নন, ইনি তাঁর পরিপক্ক কৈশোরের অতি পরিণত প্রেমিকা, তাঁর মানসসুন্দরী। আঙ্গিক ও আবেদনের এই বিশিষ্ট পরিচর্যা মীরের আমার জীবনীকে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আত্মচরিতগুলো থেকে পৃথক কোরে রেখেছে। কেবল মাত্র নবীন সেনের আমার জীবন অংশত এর জ্ঞাতিস্থানীয়। সেখানেও প্রথম প্রণয়ের একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে যার নায়িকা অতিশয় কিশোরী হোলেও প্রেমের বাসনা ও কামনাকে নিপুণভাবে ব্যক্ত কোরতে জানে এবং কিশোর নায়কও রঙ্গমঞ্চীয় পটুত্বের সঙ্গে সে লীলায় অংশ গ্রহণ কোরেছে।[৪১] প্রথম প্রেমের আদর্শায়িত বর্ণনায় প্রগল্‌ভ আরেকজন প্রবীণ পুরুষ হোলেন দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়।[৪২]

সতের

যে সকল রন্ধ্র পথে আত্মজীবনীতে মিথ্যাচার প্রবেশ করে[৪৩] তার একটি হোলো মানুষের স্মৃতির স্বাভাবিক ক্ষয় প্রবণতা। বার্ধক্যে বাল্যস্মৃতি সাধারণতঃ কুয়াশাচ্ছন্ন। যে স্পষ্টতা, অখণ্ডতা, ও ধারাবাহিকতা নবীন ও মীরের রচনায় দীপ্যমান তা এই কারণেও অনেক পাঠকের কাছে স্থানবিশেষে কল্পনারোপিত বোলে মনে হোতে পারে। দ্বিতীয়ত স্বরচিত জীবন-কাহিনীতেও লেখক রস সম্পাদনের মোহে আত্মবিস্মৃতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। মীর সাহেবের চেয়ে নবীন সেন এই মোহের বেশী বশ। তৃতীয়ত যে স্মৃতি অপ্রীতিকর তাকে পরিবর্জন করার মানবসুলভ মোহের প্রবণতা উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। চতুর্থত যে অভিজ্ঞতা গ্লানিকর হেয়বোধের সংগে বিজড়িত তাকে অবদমিত বা একেবারে বিলুপ্ত কোরে দেয়ার প্রবৃত্তি থেকেও কোনো আত্মচরিতকার মুক্ত নন।

পার্থক্য শুধু এই যে সে বিলুপ্তি কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন।[১৪] দেহের বিকার বর্ণনায় মীর সাহেব যতটা অকুণ্ঠ হোতে পেরেছেন তা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আত্মজীবনী লেখকের তুলনায় স্মরণীয়। পঞ্চম, স্মৃতি যে কেবল সময়ে ক্ষয়ে যায় বা রচয়িতার ইচ্ছায় লোপ পায় তাই নয়, পরিণত বয়সের পরিবর্তিত মানসের অনেক নতুন যুক্তিব্যাখ্যায় মণ্ডিত হোয়ে তার রূপান্তরও ঘটে। প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে মীর সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে যে তীব্র তিক্ত মনোভাব প্রকাশ কোরেছেন, মৃত প্রেমিকার চরিত্রকে যে আবেগ নিয়ে আদর্শায়িত কোরেছেন তার কতটা প্রকৃত অবস্থার অনুসারী তা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল আজিজ-উন্-নিসা। তিনি গৌরবর্ণা ছিলেন। প্রচুর হাসতে পারতেন। এই নবীনাকে যখন বিয়ে করেন তখন মীর সাহেবের বয়স সাড়ে সতেরো। এই বিয়ের আট বছরের মাথায় মীর সাহেব যে মাসিক পত্র সম্পাদন করেন তার নাম ছিল আজীজন্ নেহার। নিশ্চয়ই পত্রিকা একদিনে প্রকাশিত হয় নি, তার জন্যে দীর্ঘকাল জল্পনাকল্পনা কোরতে হোয়েছে। তখন নামকরণের পেছনে যে পতিহৃদয় ক্রিয়াশীল ছিল তার স্বরূপ পত্নীবৈরিতার আলোকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। পারিবারিক সংবাদ পরিবেশনে মীর সাহেব যে অনেক সময়ে রচনাকালীন মুহূর্তের পরিবর্তনশীল ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হোতেন তার অন্য দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে। নিজের পিতামাতার, বিশেষ করে মাতার অসন্দিগ্ধ অকৃত্রিম অমলিন পতিপ্রেমের যে চিত্র উদাসীন পথিকের মনের কথায় এঁকেছেন,[১৫] আমার জীবনীতে তার বিরুদ্ধ সত্যকেই প্রকারান্তরে স্বীকার কোরেছেন।[১৬] এই জন্যে ইতিপূর্বে আমরা এরকম মত প্রকাশ কোরেছি যে মীর-জগৎ ও মীর-মানসকে সম্যক রূপে উপলব্ধি কোরতে হোলে তাঁর উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮০৯), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮০৯), আমার জীবনী (১৯১০) ও বিবি কুলসুম (১৯১০) প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থকে পাশাপাশি রেখে পাঠ কোরতে হবে, এক বইয়ের দুই চরণের মধ্যবর্তী অনুক্ত মর্মকে অন্য বইয়ে উদ্ঘাটিত তথ্যের তুলনামূলক বিচার দ্বারা খোলাসা করে নিতে হবে! মীরের অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনাকালে আমরা আমাদের এই বক্তব্যকে আরো বিশদরূপ দান কোরতে সচেষ্ট হবো। ইতিমধ্যে মূলের সংগে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হোক, এই উদ্দেশ্যে আমার জীবনীর দীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহের পৃষ্ঠানুক্রমিক সংকলন পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল।

পরিশিষ্ট

আমার জীবনী। প্রথম খণ্ড। স্বত্বাধিকারী শ্রী মীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক গ্রন্থিত। কলিকাতা, ৩৬, নং গোরাচাঁদ রোড, ইটালী—মুন্‌সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত। ১৩১৫ সাল ১লা আশ্বিন। কলিকাতা, ১৭, নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 'কলিকাতা যন্ত্রে' শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটী কথা।

১। আমার জীবনী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ড ৮ পেজী ডিমাই চার ফর্ম্মা মাসে মাসে অথবা মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে।

২। প্রতি খণ্ডে সম্পূর্ণ দুই কি তিন ফর্ম্মা আমার জীবনী থাকিবে। অপর ফর্ম্মায় গাজীমিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে। আমার জীবনীর সহিত গাজী মিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংস্রব আছে—.....।.....

১০।..... ...।

বিনয়াবনত— ...।

আমার আত্মকথা। প্রার্থনা।

হে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অসীম করুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বর! সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপিতা, সর্ব্বময় সৃষ্টিকর্ত্তা এলাহি! তোমার অনন্ত মহিমা স্মরণ করিয়া সষ্টাংগে প্রণিপাত সহিত তোমারই সহায়ে 'আমার জীবনী' জনসমাজে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রভু, সহায় হও। সত্য তত্ত্ব প্রকাশে হৃদয়ে বল দেও। অসত্য ঘটনা, অসত্য ধারণা প্রকাশ হইতে লিখনি সংকোচিত কর। সদা সর্ব্বদা পরহিংসা পরদ্বেষ পরকুৎসা, পরনিন্দা হইতে তফাৎ রাখিও।...দয়াময়! 'এসলামের জয়' প্রকাশ আশা পূর্ণ করিয়াছ। 'হজরত ইউসোফ' যন্ত্রস্থ—শেষ আশাই—আমার জীবনী—কর জোড়ে প্রার্থনা করিতেছি অধমের মনের আশা পূর্ণ করিও।

মাননীয় পাঠকগণ সমীপে।

প্রিয় পাঠকগণ! 'আমার জীবনী' প্রকাশ কথা হঠাৎ মনে হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি তাহা নহে। এ সংকল্প বহুদিনের। এ আশা একযুগেরও অধিককালের। কাল চক্রে—চক্রে অবস্থার গতিকে, আজ ১৬ বৎসর

পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও আশা পথে দণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। দেখুন—প্রমাণ। উদাসীন পথিকের মনের কথা পুস্তকে দ্বিতীয় তরংগে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন! কি লিখা আছে। বাংলা ১২৯৭ সালে আমার জীবনীর বিষয় আলোচনা হইয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে তাহাও লিখক আভাসে বলিয়াছেন। আজ কোন দিন? ১লা আশ্বিন্ ১৩১৫ সাল। প্রায় ১৯ বৎসরের কথা। ১৯ বৎসর পূর্ব্বের সঙ্কল্প। .....

আমার জীবনে শত শত ত্রুটী, শত শত জাহেলী (মুর্খতা) এবং অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি মানব সন্তানও যদি সাবধান সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তাহা হইলে আমার জীবন স্বার্থক ও সহস্র লাভ মনে করিব। আর, একটি কথা বলিয়াই আমার কথা শেষ করিতেছি। আমার জীবনী অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে। আর যে সকল কথা মোসলমান সমাজে সর্ব্বসাধারণ মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার অবিকল বাংলা আমি জানি না। ভাবার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। লাভের মধ্যে শ্রুতি কঠোরতায় কেহ শুনিতেই ইচ্ছা করেন না। সেই সকল শব্দ যেমন প্রচলিত আছে সেই রূপই প্রকাশ করিব।

১ উপক্রমণিকা।

আমার জীবনী।

আমি কে?

চিনি না। চিনিতে পারিলাম না। কতদিন ভাবিলাম কত চিন্তা করিলাম, কিছুই হইল না,—আভাস ইংগিতেও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতদিন জনমানববিহীন বিজন বনে, কত দিন সুপ্রশস্ত প্রান্তরে, কত নিশিথ সময়ে নির্জ্জন গৃহে, শয়ন শয্যায়, দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উচ্চশিখরে নির্জ্জন উপবনে, ঘোর নিশীথ সময়ে গৌরনদী তটে, বসিয়া কত চিন্তাই করিয়াছি,—জানিতে পারিলাম না—আমি কে? ..

২ মাথা একটি। মাথায় কিছু নাই বলিয়াই বোধ হয়।...

৩ হাত পা আছে—অকর্ম্মার এক শেষ। মসজিদে যাইতে কষ্ট বোধ হয়।...

কর্ণ মহোদয়...সৎ কথা সৎ উপদেশ.. চাহেন না.. মনের কথা আর কি বলিব! সকল কথা খুলিয়া বলিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারি। মনের কথা মনেই থাকিল।...

কম নহে, বাল্য জীবন হইতে গত ৬৫ বৎসরের ঘটনা শুনাইব। সংগে সংগে বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাও সময় সময় প্রকাশ করিব।...

সত্যাশ্রয়ে সত্যই আমার জীবনীর মূল উদ্দেশ্য। সত্য প্রকাশেই আমার স্থির সংকল্প।...

...লোকাচারে যাহা বলে—পুরুষানুক্রমে লৌকিক আচারে ব্যবহারে কথায়, লিখিত পুস্তকে কুরসীনামায় গভর্ণমেণ্টের আপিসে আদালতে, ফরিদপুর সব জজ আদালতে ১৯০৬ সালের ৩৯ নং মকদ্দমায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্য দেহের মীমাংসা করিতেছি আমি কে ?...

চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ। আমাদের মহামাননীয় বৃটিশরাজ সরকারী গেজেটে ১৯০০ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা গেজেটে আমার বস্তানী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন ? ভূশ বাহবা দিয়া লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন,—রংপুর অঞ্চলের কোন ছায়া অবলম্বন করিয়া গাজিমিয়াঁ চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। তারপর ১৩০৮ সালের পৌষ মাসের পত্রিকা প্রদীপে ... ।

...লাহিনী পাড়ার বাটীর পশ্চিম-দ্বারী বৃহৎ ঘর, যে ঘরে আমার পূজনীয় মাতৃদেবী শয়ন করিতেন। সেই ঘরে আমার জাতঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। যত ভাই-ভগ্নি—ঐ এক ঘরেই সকলের জন্ম, সন মাস তারিখ দণ্ড সকলি জন্ম পত্রিকায় লেখা আছে।...সংস্কৃত কয়েকটি বচন সহ এবং জ্যোতিষি পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মাত্র উল্লেখ করিব।... সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বাংলা অক্ষরে কম্পোজ করা কঠিন বলিয়াই এবার হইল না, আগামীতে চেষ্টা করিব। যদি বলেন, এরূপ জন্ম-পত্রিকা হইবার কারণ কি ? খাঁটী মুসলমান গৃহে এরূপ ঘটিবার কারণ কি ? ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা ছিল, তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আমি সেই দুর্ঘটনা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি...ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে অনিচ্ছা। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় শৌথিল্য। জাতীয় ভাব রক্ষায় অমনোযোগী। এ সকল ঘটিবার কারণ ? বিধর্মীদিগের প্রবল পরাক্রম, ধন-গৌরব, শাসন, বিচার, রাজ্য-বিভাগ, সমগ্র বিভাগেই মুসলমান শূন্য। যাঁহাদের দ্বারা এ সকল স্থান অলঙ্কৃত, তাঁহারা দেখিতেও ভাল—ক্ষমতাও কম নহে।—তাঁহাদের বাক্স, সিন্দুক টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ। বিজাতীয় ভাষার কল্যাণে রাজপুরুষদিগের সহিত মাখামাখি ভাব, কাজেই নির্জ্জিব নিরক্ষর বঙ্গীয় মুসলমানগণ অনেক কার্যে তাঁহাদের আদর্শ...। অনেক বড় বড় জমিদার, ধনী মুসলমান,—জোড়া জোড়া প্রতিমা তুলিয়া আশ্বিন মাসে ... দু'দশ হাজার বাহবা গ্রহণ... ।

লাহিনীপাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতন্নেসার গর্ভে, বাটীর আংগিনার মধ্যে ঘর....আমার জন্ম হয়।

৯৭ আমার যে সময় জন্ম হয়—সে সময় আমাদের দেশে অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল। ভূতও এক শ্রেণীর ছিল না।...শিশু সন্তানদিগের জন্য পেঁচাপাঁচি নির্দ্ধারিত ভূত। জাতঘরে তাহাদেরই অধিকার আধিপত্য। জাতঘরের বারান্দায় দিবারাত্র সমভাবে আগুন জ্বলিত। শুর্কন কাঠের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। ক্ষণকালের জন্য আগুন নিবিবে না। বারান্দার এক পার্শ্বে চাটাই দ্বারা ঘিরিয়া দিবারাত্র কোরাণ-শরীফ পাঠ...। জন্মের পরক্ষণেই সাতবার আজান...। প্রত্যেকের মনে বিশ্বাস যে আজানের আওয়াজ যতদূর বাতাসে লইয়া যায়, কি স্থির বায়ু ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, ততদূর ভূত-প্রেত, দেও-দৈত্য, দানো, জেন-পরি অধিকন্তু সয়তান থাকিতে পারে না। ইহার পরেও বাড়ীর সীমার মধ্যে উচ্চ বংশখণ্ডে গরুর মাথা—মূড় ঝাটা বাড়ুন বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। জাতঘরের দরওয়াজার একপার্শ্বে গরুর মাথা গোহাড় কাঁটা কুমড়ার ডাটা সহ পাতা কপাটের গায়ে চৌকাটের সংগে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জাতঘরের
৯৮ কপাট জানালার ফাক, বেড়ার ছিদ্র—যেখানে যতটুকু ছিল, তাহাও বন্দ করা হইয়াছিল ··। বাতাসও যাইবে না। তাহার পর জাতঘরে সমস্ত রাত্রি যে প্রদীপ জ্বলিবে, সে প্রদীপের রশ্মিকণা বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পারে। এ সকল আয়োজন কেবল পেঁচাপেঁচির ভয়ে।...পাঁচ দিন গত হইলে ষষ্ঠির রাত্র। ...ছয় কুলার রাত্র কহে।...সেই রাত্রে ঘর-দ্বার বন্দ হওয়ার পূর্বে—ভাল কলম দোত কালি, সাদা কাগজ, একখানা কলমকাটা ছুরি, এই কয়েকটা জিনিষ অগ্রে যত্নপূর্বক এক পাত্রে করিয়া অন্য কোন স্থানে রাখা হয়। তাহার পর (সরস্বতীর বিদ্যার) ঢোল তবলা সেতার বেহালা তাস পাশা দাবা লাঠী শুড়কী তরবার, ইত্যাদি শিশুর শিয়রে রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল বিদ্যায় শিশু পারদর্শিতা লাভ করিবে—ইহাই আশা।

৯৯ ...আকিকা...। কোরবানী...। তাহার মাংস, হাড় হইতে এমনভাবে ছাড়াইয়া লইতে হয় যে হাড়ে আঘাত না লাগে, দাগ না বসে, ভাঙ্গিবার ত কথাই নাই। ..

১০২ পিতামাতার খাওয়া নিষেধ।...গাজীর গান হইয়াছিল।...চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি) হইয়াছিল।... প্রবাদ ছিল মুনসী
১০৩ সাহেব হাতে খড়ি দিলে তাহার দারগাগিরী চাকুরী না হইয়া যায় না। মুনসী সাহেব বাঙ্গলার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। সে সময়ে বাংলা পত্র, কথাবার্ত্তার ভাষায়—অর্থাৎ যে গ্রামের যেরূপ কথা তাহাতেই লিখা হইত। খত্ পত্র ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই।...

১০৪ মুন্সী সাহেবরা বাংলার কিছুই জানিতেন না। যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়-কারী গোমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল, তাহারা জমা খরচ বাকীজায়, দাখিলা লিখা চিঠি পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাঁহার নাম জাঁকিয়া উঠিত।...

১০৫ এক বৎসরের মধ্যেই কোরাণ শরিফের প্রথম পারা (অধ্যায়ের) তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরা পাঠ করা শেষ করিলাম। অক্ষর পরিচয়ে বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরাণ পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরাণের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে ?...

পাঠশালায় আসিয়া কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া জোরে জোরে কবিতা পড়িতাম, পাঠশালার ছুটীর পূর্ব্বে আমরা সকলে কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িতাম, নন্দী মহাশয় পড়াইতেন।

জয় জয় দেবী, চর চর সার
কুচ যুগে শোভে মুক্তার হার
বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
ত্বং সরস্বতী নির্ম্মল বরণ,
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণ। (ইত্যাদি)

মাথা খুব জোরে কলমের উপর চাপিয়া ধরিতাম, যে কলমটী কপালে লাগিয়া কপালের সঙ্গে বাধিয়া উঠে, বাধিয়া উঠিলেই মহা পণ্ডিত হইব।...গলা টানা করিয়া মাথা পিঠের দিকে নীচু করিয়া রাখিতাম, যে কলম কপাল হইতে ছটকিয়া না পড়ে।...

১০৯ কেনী বলিলেন—মীর সাহেব ! আপনি আমাদের অর্থাৎ একা আমার নহে সমুদয় ইংরেজ জাতীর হিতৈষী। বিশেষ আমরা যে কয়েকজন নীলকুঠী করিয়া এদেশে বাস করিতেছি, আপনি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্খী। যথাসাধ্য আমরা সকলে আপনার উপকার সাহায্য করিতে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। যে প্রকার সাহায্য আপনি চাহিতেছেন, আমরা করিতেছি। আমি যতদিন বাঁচিব করিব। আমাদের সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস—আপনিও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য উপকার করিবেন। আমাদের নীলকরদিগের —এমন কি বৃটিশ জাতির হিত ভিন্ন কখনই অহিতের

১১১ দিকে অগ্রসর হইবেন না। এই সকল ভাবিয়া...আপনার বড় পুত্রকে...বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান।...আপনার একটি পয়সা খরচ লাগিবে না। যাওয়া আসার খরচ...থাকার খরচ পড়ার খরচ সমুদায় আমি দিব।...চার বৎসর মন বেঁধে ছেলেকে আমার কন্যাদের সহিত বিলাত পাঠান।...

[এই খণ্ডের শেষে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে : মুন্সী সাদেক আলীর সহিত আমার জীবনীর কোন সংশ্রব রহিল না। আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান মীর মহবুব হোসেন... প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলেন।]

পঞ্চম খণ্ড | ১৩১৫ মাঘ ॥

১১২ আমার জীবনীর পাঠক কে ?

এইক্ষণে সেই অসীম শক্তিধর জয় জগদীশ নাম করিয়া আপাততঃ ১২ খণ্ডে শেষ করিতে পারিলেই লজ্জার দায় হইতে রক্ষা পাই। ভবিষ্যত অন্য চিন্তা—অন্য বন্দোবস্ত। —সুধু অমুক তারিখে জন্মিলাম, অমুক সনে অমুক কার্য্য করিলাম,—অমুক তারিখে মরিলাম ইহাতে জীবনী সম্পূর্ণ হয়না। আর সকল জীবনীতেই বিশুদ্ধ চরিত্র কার্য্যদক্ষতা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়—সরল, দেশহিতৈষী ইত্যাদি গুণেরই দীপক বেহাগ ললিত, ভৈরবী রাগের গান,—চৌতাল ধামাল ধ্রুপদ, আড়াঠেকা বাজনার সহিত শুনিতে পাই। কিন্তু আমার মত হতভাগার জীবনীর ন্যায় জড়িত জীবনী এ পর্য্যন্ত কাহার শুনি নাই—দেখি নাই। —হইতে পারেন তাঁহারা স্বর্গীয় দেবতা, হইতে পারে তাহারা···কিন্তু...

১১৩ কবীরের বচনের সমর্থন করিয়া আমরাও বলিতেছি জগতে আসিয়া কেহই অক্ষত শরীরে বাহির হইতে পারেন নাই। কিছু না কিছু ক্ষত হইয়াছে, আর না হয় কিঞ্চিৎ দাগ লাগিয়াছে। আমার জীবনীর—দাগ ধরা,—যাঁহার জীবনী তিনি অক্ষতশরীরে বাহির হইতে পারিবেন না। কারণ তিনি পুণ্যাত্মা নহেন—মহাপাপী! পাপীর জীবন কাহিনী শুনিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইবে না।...তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। কেহ পাঠ না করিলেও আমরা দুঃখিত নহি। ...আর কিছু না হউক, ভবিষ্যত বংশধরগণের বিশেষ কার্য্যে আসিবে। আমার জীবন কাহিনী শুনিয়া কেহ সতর্কও হইতে পারেন।...আমার জীবনীর পাঠক কে ?—লোক দেখিতে পাই না। প্রমাণ ? অধিকাংশ গ্রাহকই নীরব।

১২০ [মা বাবাকে বলছেন]...আপনার নিখুঁত কুলে এক হাজার টাকার লোভে কালি মাখাইবেন না। আপনি নাদির হোসেন মুন্সীকে জানেন ?... মীর মহেব আলীর ফেল্ জামিনের মকদ্দমায় যে এক বৎসরের ফাটক হইয়াছিল, মীর মহেব আলীই আমার নিকট বলিয়াছেন, নাজীর নাদের হোসেন আমার পায়ে বেড়ী না দিয়া লোহার কড়া পরাইয়া দিলেন। ...নাদের হোসেন যসহরের নাজীর ছিল, সেই সময় গরীবপুরের ফকীর মামুদ তরফদারের কন্যাকে বিবাহ করে। সেই ফকীর মামুদের নাতীই নাদের হোসেনের পুত্র। ...আপনার মেয়েকে তরফদারের নাত বৌ করিবেন না। .. দেওয়ার চাইতে বিষ খাওয়াইয়া
১২২ মেয়েটিকে দুনিয়া হইতে তফাৎ করা ভাল। ... তৃতীয় মাসে সাম্‌সন্‌নেসার জ্বর ...বিবাহ কথা ফুরাইল।

পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত।... দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণে নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্র করিয়া গিয়াছেন। পরিণাম ফল... [নীল বিদ্রোহ] ...নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কি প্রকারে শান্তির বাতাস বহিল প্রজারা আশ্বস্ত হইল, ব্রিটিশ রাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক উদাসীন পথিকের মনের কথা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের ক্রাট ইংরেজের কুৎসাই গাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজের মধ্যে যে দেব ভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নিমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সে ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপসত্ব ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দুশ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম পাতফোঁড়—যে পাতে খান সে পাতই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে।...

১২৩ [বাবার উক্তি :] ... তবে কেন বলিলেন যে ইংরেজ কি চিরকালই এদেশে থাকিবে! হ্যাঁ নীলকাজ বন্দ হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এদেশে থাকিবে। আপনারা যে এক জোট হয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নীল নাও হতে পারে, নীলকর সাহেবরাও আর নীল বুনানী করবেন না। তাঁদের যা কিছু করা—এই দেশের লোক দ্বারাই করেন।... অন্য কারবার আরম্ভ করবেন। আপনারা যে তাহাদিগকে এ দেশ হতে তাড়াতে ফিকির করছেন তাহা কখনই পারবেন না। নীল না হয় তার যে উপায় থাকে করুন আমি তার মধ্যে আছি। কিন্তু নীলকর ইংরেজ তাড়ান মধ্যে আমি নই।....

১২৪ এক বৎসর খাটিয়া মীর মহেব আলী এইক্ষণে নীলবিদ্রোহী সময়ে প্রজার দলে মিশিয়াছেন। সাগোলামাজ্জমও প্রজার দলে... কোম্পানীর আমলে বাঙ্গলা দেশে দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। জমিদারেরাই প্রজার হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। জমিদারের অত্যাচার প্রজার অসহ্য হওয়াতেই যেন তাঁহাদের আর্ত্তনাদে পরম কারুণিক দয়াময় জগদীশ্বর ইংরেজ নীলকরকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।...প্রজা জমিদার তালুকদার নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে কতই নাজেহাল হইয়াছেন, কত অপমান ভোগ করিয়াছেন, তাহা উদাসীন পথিক দেখাইয়াছেন।...দৌরাত্ম্য,
১৩৩ অবিচার, স্বার্থপরতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে, সাধারণ প্রজার মনে একতার ভাব উদয় হয় না। প্রজা নীলকুঠীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া

জোটবদ্ধ হইল। শেষে কার্য্যও করিল—সফলকামও হইল। সমুদায় নীলকুঠী দেউলিয়া—ঋণদায় জমিদারী দালান কোঠা খরিদ করিয়া লইলেন।

১৩৪ নীল বিদ্রোহের পরেই আমার পূজনীয়া জননীর পীড়া। বৎসরকাল ... ভোগ করিয়া ... দেহত্যাগ ... আমার বয়স ১৪ বৎসর ... মহ্‌তেসামের ৪ ... বঙ্গলাল হোসেনের ... দেড় ... ।

...সেতার বাদ্য মধ্যে আমার পিতা—বেলা বাজাইতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। [বেলগাছির জমিদার] করিমবক্স চৌধুরি সাহেব গত্‌ বাজাইতে ওস্তাদ ছিলেন। ... যেদিন কন্যা মরিয়াছেন — কন্যার দাফন কাফন শেষ করিয়া আসিয়াই [পিতা] সেতার লইয়া বসিয়াছিলেন সারাটি রাত্রি সেতার বাজাইয়াছিলেন।... অনবরত দুই চক্ষের জলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া বুক বহিয়া

১৩৫ পড়িতেছে।... মাতার মৃত্যুদিনের ঘটনা আমার স্মরণ আছে।...পিতাও চক্ষের জল

১৩৬ ফেলিতে ফেলিতে, কতক্ষণ পর বলিয়া উঠিলেন। — আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হইল না। আজ দুইটা বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও আমাকে দেখ নাই, অথচ এক বাড়ীতেই দুজন বাস করি।... তুমি তোমার মনের ঘৃণায় আমাকে ডাক নাই আসি নাই। আমিও আমার মনের বলে ... আসি নাই। আজ শুনিলাম তুমি সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে ... মুখের আবরণ ফেলিয়া দেও — জনমের মত তোমাকে দেখিয়া যাই।...

ষষ্ঠ খণ্ড। ১৩১৫ ফাল্গুন।

১৪৫ ...পিতা নিরবে দুই চক্ষের পানি ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। জননী তাহা অনুমানে বুঝিয়া মুখাবরণ সরাইলেন চক্ষে জলধারা।

১৫১ ...আমাদের দেশের লোকে সে সময়ে সাহেবের নাম শুনিলেই কাঁপিয়া উঠিত।... দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে মেড়ুয়াবাদী এক জাতি আছে। তাহারা সকলেই নৌকায় থাকে, নৌকায় শিল পাটা তিশি গম, পাথুরিয়া চুন বোঝাই করিয়া পশ্চিম দেশ হইতে উত্তরাঞ্চলে লইয়া যায়। ... গৌর নদী হইয়া বহরে বহরে নৌকা যাইত। ... মেড়ুয়াবাদী অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় নৌকার বহর উজান মুখে চলিলে গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। স্ত্রীলোকের ঘাটে যাওয়া বন্দ হইত।...

১৬৪ ...এখন আর আমি বালক নহি—যুবক। ... বিদ্যাশিক্ষা এখানেই যেন ইতি বোধ হইতেছে।... কুমারখালীতে ইংরেজী স্কুল হইয়াছে, বাটী হইতে ছয় মাইল ব্যবধান। তাহার পর ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মরিবার সময় গিড়ী মিড়ী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ্‌ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুরুজনগণের ধারণা যে ইংরেজী পড়িলে একরূপ ছোটখাট

শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়। জবহা ঝটকার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক নাপাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।...

১৬৫ এই সময় আমার কার্য্য বাংলা চিঠিপত্র আর বাঙ্গসার হেঁয়ালী লিখা। আমার প্রথম হেঁয়ালী যথা—

কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা।
লবংগের বংগ ফেলে
বেছে বেছে খা॥

...ফারসী বিদ্যা ... অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি পদ্য মুখস্ত আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া মুন্সীজিকে সংগে করিয়া আমরা ৫।৬ জন শিষ্য অন্য কোন আত্মীয় বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম।...

১৬৯ ...পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ।

সপ্তম খণ্ড। ১৩১৫ চৈত্র।

১৭৮ যৌবন জোয়ারায়ন্ত।
প্রথম প্রবাস।

১৮০ ....পিতার সংগে পদমদী...। চন্দন মৃগীতে নবাব মীর মহাম্মদ আলী...বৈমাত্র মাতামহী...। যেমন আমরা বলি দেখ নাই, পদমীর লোকে বলে দেহ নাই। ঘোড়াকে বলে গোরা, ঘর স্থানে ঘড়, আবার খড় স্থানে খর। ভাই স্থানে, বাই, চক্ষে দেখ না চহি দেহ না, ভাত বাত, নারকল নারেল, বেল—ব্যাল তেল—ত্যাল, এইরূপ কাপর, মুরি, ছেরা—নানা কথার পরিবর্ত্তন ভাব দেখিলাম।

১৮১ ...নবাব সাহেব খুব ভালবাসিলেন।... পূজনীয় পিতার সহিত নানা-প্রকার আমোদ আহ্লাদ করেন।... গান বাজনার মজলিস প্রায়ই হইত ... যাওয়ার অধিকার ছিল না। গোপনে দালানের অন্য কক্ষে থাকিয়া ... শুনিতাম। স্ত্রীলোকেরা নাচ করিত তাহাও গোপনে গোপনে দেখিতাম।

১৮২ [নবাব বিরোধী মাতামহীর উক্তি]

১৮৮ একদিন নবাব সাহেবের বজরার মধ্যে বসিয়া আছি। আহারান্তে নবাব সাহেব তাস খেলিতে ইচ্ছা করিয়া তাস হাতে লইয়া বাঁটিতে লাগিলেন। .. কি

একটা নাম ধরিয়া ডাকিতেই একটি স্ত্রীলোক, পিছনের কামরা হইতে আসিয়া নবাবের বামদিকে ঘেঁসিয়া বসিল এবং নবাবের হাত হইতে তাস কাড়িয়া লইয়া নিজেই ফিটিতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। কারণ নবাব সাহেব গুরুজন, তাহার পর স্ত্রীলোকের সঙ্গে এরূপ একত্র এক বিছানায় কখনও বসি নাই। ... প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। .. [নবাব সাহেব :]—খেল। দোষ কি? আমার সংগে খেলা করিবে তাতে কোন কথা নাই। তবে নিতান্ত ছোট লোক নীচজাতি বদ্‌লোকের সঙ্গে খেলা করা, তা যে খেলাই হউক, এমনকি! বসা-ওঠা নিতান্তই অন্যায়। খেলা করা দেল বহলান ইহাতে কোন দোষ নাই। জানত, খেল। ...

১৮৯ ...সে খেলও আবার বিবি ধরা।...এক দুই করিয়া ৭ বার...

১৯১ বিবি ধরিলাম।

১৯২ ...বাইজি খেমটাঅলীদিগের নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে। ...নবাবই আলাপ... করিতেছেন।

১৯৫ ...কোন কথা নাই—তবু ভয়। নির্দ্দোষ হৃদয় সদাসর্বদা নির্ভয়, সুস্থ ও সবল। সেই বজরায় যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কয়েকদিন তাস খেলা করিয়াছি, তাহার চক্ষে চক্ষু মিলাইয়াছি, ভ্রূর টান সেও দেখাইয়াছে, আমিও দেখিয়াছি। কপাল কুঞ্চনও তাহাই। সময় সময় খেলার ভাবে নয়ন বাঁকা—ভ্রূ বাঁকা সেও দেখাইয়াছে আমিও বাধ্য হইয়া দেখাইয়াছি। ঈষদ হাস্যভাব—দুইয়ের দেখাদেখি হইয়াছে। মুচকি হাসি তাহাও ঐ খেলার জন্য, এক কথায় দুই অর্থ—প্রকাশ্য আর গুপ্ত। তাস নিক্ষেপ চটাপটী—বল পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে মনে নানা ভাবের উদয় হইয়াছে।...

১৯৭ বাইজীর হাত-পা নাড়া, চখ্ ঠারা, মাথা কাঁপান, দেহ দোলান, বক্ষস্পন্দন, কটিচালন যাহাকে নাচ বলে, তাহা দেখিলাম ...।

২০৯ অষ্টম খণ্ড। ১৩১৬ বৈশাখ।

মাষ্টার বাবু বলি এখন দেখুন চন্দ্রপীড় শব্দ।...আমি ছোট পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিলাম,—কাদম্বরী, আর পুস্তকের নাম পড়িয়া দেখিলাম শব্দার্থ প্রকাশিকা। ...চুপি চুপি পড়িতে লাগিলাম।

২১০ ...পদমদী অঞ্চলে চিরকাল বাঘ শূকরের ভয়। যে সময়ের কথা সে সময়ে শূকর অপেক্ষা বাঘের ভয় বেশী ছিল।... খরাপাতিয়া শ্রীকণ্ঠ মাছ ধরিতেছিল...বাঘ...

২১৫ এই অঞ্চলে তিন প্রকারে বাঘ মারে। ১। বাঁশপাতা ফাঁদ। ২। খোঁয়াড়, ৩। তীর পাতিয়া।

২২৪ [বংশ পুরান। মাতামহীর জবানীতে।]

২৪৪ নবম খণ্ড। ১৩১৬ জৈষ্ঠ।

....যদি তোমার বাপ অন্য স্ত্রীলোক ঘরে না আনিতেন, যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবেন কেন?... সতীনের যন্ত্রণা আগুনে পীর পয়গম্বরের মেয়েরা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারে-খারে গিয়াছেন। আমরা ত কোন ছার। বিবি হনুফার জন্য বিবি ফাতেমা জ্বলিয়াছেন। তারপর ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জয়নাবের কথা...?

২৫৭ [কলিকাতা অভিযান]

২৬৪ ...পদমদী যাইয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম। নূতন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে...।

দশম খণ্ড। ১৩১৬ আষাড়।

২৭৪ মাষ্টার বাবু প্রতি রাত্রেই নবাবের মজলিসে আসিতেন গান করিতেন, তাস খেলিতেন, পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া থাকিতেন।...অতি গুপ্তস্থানে বসিয়া আমদ
২৭৫ আহ্লাদ নাচগান, রগড় রহস্য দেখিতাম।...মনোমোহিনীর শয়ন শয্যার এক
২৭৬ পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া প্রমদ কুঠুরীর সমুদয় অবস্থা দেখিতাম। এই তাস খেলার ফল ভবিষ্যতে মহা বিষময় ফলিল।... সর্ব্বদা মেলামেশার গুণ অতি চমৎকার। নিজে ভুগিয়া ভোগ করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বুঝিলাম, সর্ব্বদা মেলামেশা একত্র
২৭৭ বসা-উঠা, একত্র আহার ইত্যাদি কার্যে যাহাদের সহিত একত্র মেশা যায়, অর্থাৎ যে মিশিতে যায় সে যদি কাঁচা মন, কচি মাথা, দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া মিশিতে যায়—তবে সে পাকা মন, সুদৃঢ় মস্তক এবং সবল হৃদয়ের অনেক গুণ, মস্তকের বহু ভাব, পাকা মনের অনেক গুণ সঞ্চয় করিতে পারে।... পাকা পোক্তর কিছু হয় না, মরণ হয় কাঁচার।...

২৭৯ ...হল কামরায় প্রায়ই বাতি থাকে না।...থাকিলেও এক কোণে সামান্য...। ঘরের মধ্যে আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী মূর্তি। সেই এক প্রকার স্নেহে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুকে স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই মোলায়েম সুগন্ধিযুক্তগণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটি কথা চুপি চুপি বলিলেন—এবং আমার হাতে কয়েকটি পানের খিলি দিয়া বলিলেন, ফেলিও না, মার খাইবে। বেত লাগাইব। আমি দেখিব। ওখানে বসিলেই দেখিতে পাইব। তুমি ফেলিয়া দিয়াছ কিনা।...

২৮১ অভ্যাস দোষে, সংগ দোষে এরূপ হইল, যে আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সংগে হাসি রহস্য তাস খেলিতে ইচ্ছা করে। একটি বৎসর এইভাবে...। পিতৃদেবের আদেশ কৃষ্ণনগর যাইয়া কলেজে পড়।...

২৮২ বগুলা ষ্টেশনে....কুলি-মজুর, সইস-কোচম্যান মুখে বাংলা কথা শুনিয়া আমি ত অবাক যে এই সকল লোক এত ভাল কথা বলে। আমাদিগকে যে কথা সন্ধান, তালাস, খুঁজিয়া মুখে আনিয়া বলিতে হয়, এরা স্বভাবতঃই অনর্গল বলিয়া যাইতেছে।...এতই মিষ্ট...এত মর্যাদাপূর্ণ...।

২৮৫ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাখা। যেমন পরিশুদ্ধ বাংলা তেমনই লালিত্যপূর্ণ। তেমনি কণ্ঠস্বর রস পোরা।

২৮৬ কলেজে ভর্তি হইলাম। কলিজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে...। কৃষ্ণনগরের চাল-চলন দেখাদেখি ক্রমে আমার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল। দশজনের আচার ব্যবহারই আমার অনুকরণীয় হইল। কৃষ্ণনগরে মুসলমানের গৌরব মাত্র নাই। হিন্দু প্রধান দেশ। ধুতি পরিতে শিখিলাম। চাদর বা উড়নী গায়ে দেওয়া অভ্যাস হইল। মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাসানেবাল করিলাম। হায় হায়! বাউরী চুল কাটিয়া থাক্ থাক্ করিলাম। পিছনের দিকে কিছুই নাই। সম্মুখভাগে সিতীকাটার উপযুক্ত মত থাকিল। পাজামা চাপকান বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। টুপীটাও ক'দিন পর সহপাঠীরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল। মুসলমান যাহারা কৃষ্ণনগরে আছেন, আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। পরন পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী। চালচলন হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী। মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী যথা—সামসদ্দীন, সতীশ। নাজমাল হক, নজু। বোরহান, বিরু। লতীফ, নতু। মশাররফ, মশা। দায়েম, দাঁশ। মেহদি, মাদি। ফজলল করিম, ফড়িং। এই প্রকার নামে ডাকা হয়।...তেল মাখিয়া বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া হয়। ভিজে কাপড়ে বাসায় আসিয়া কাপড় বদলাইতে হয়।...

২৮৯ একবার কলিকাতায় গেলে মুন্সী নাদের হোসেন পুত্র কারাম মাওলা ওরফে চাঁদ মিয়ার সহিত দেখা।...

২৯৫ ইতিমধ্যে নাজির সাহেব আসিয়া...বলিলেন...আমার বাসা এখানেই আছে, কারাম মওলাও কালীঘাটের স্কুলে পড়ে, আমার ইচ্ছা যে আপনিও আমার এই বাসায় থেকে কালীঘাট স্কুলে পড়ুন। আপনার বাবার নিকট আমি লিখিয়া পাঠাইতেছি।...

একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড। ১৩১৬ ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন।

আমার জীবনী দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশ হইয়া আপাততঃ কিছু দিনের জন্য বন্ধ রহিল।...

আমার নিবেদন।

আমি এইক্ষণে জিয়ন্তে মৃতবৎ হইয়া আছি। দুঃখের কথা কি বলিব, বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ আমার জীবনের জীবনী প্রিয়তমা সহধর্মিনী বিবি কুলসুম পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি আছি এইমাত্র বিশ্বাস। কিন্তু কোন বিষয়ে আমার উৎসাহ যত্ন বাসনা সাধ কিছুই নাই। এই সকল কারণে জীবনী প্রকাশে আরও বিলম্ব হইল। আমার দুঃখে যদি কেহ দুঃখ বোধ করেন, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। বিবি কুলসুম নামে একখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।

অধুনা—জীবন্মৃত
মীর মশাররফ হোসেন
পদমদী

বিদায়।

চির বিদায় নহে। কিছু দিনের জন্য বিদায়। ... পূর্ব্বে কত কথা, কত মধু বোল, ১।০ আনা দিবার বেলায় গোল বাধিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ঐ খরচায় বার সংখ্যা দিব। বাধ্য হইয়া প্রকাশে বাধ্য হইলাম।...এই বার সংখ্যা জীবনীতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক জীবনের প্রথম হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত (বিবাহ ঘটনা) প্রকাশ হইয়া রহিল। জীবনের চারিভাগের এক ভাগ প্রকাশ হইল। অদ্য পর্য্যন্ত (১৩১৬ সালের ভাদ্র মাস) ৪৩ বৎসরের ঘটনা প্রকাশে বাঁকি রহিল। ...

১৩১৬ সন
১লা ফাল্গুন।

বিনয়াবনত—
জীবনী লেখক।

৩০৬ কলেজ একমাসের জন্য বন্ধ হইল। চাকরটীকে সংগে করিয়া বাড়ীতে আসিলাম ... চিকণ ধুতি পরিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া সিতী কাটিয়া, খোলা মাথায়—জীবনে তাঁহার (পিতার) সম্মুখে যাই নাই। এই প্রথম গমন।... কৃষ্ণনগরের কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিনদ সেখ দ্বারা তোমার খাওয়ার জন্য গোমাংসের ঝুরি পোরা সমশ পিঠে, — আর মুরগীর ডিম যাহা পাঠান হইয়াছিল ... তোমার বাসায় লইয়া যাইতেই নাকি অনেক ছেলেরা কাড়াকাড়ী করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল!... হাঁ তাহারা সকলেই খায়। ... হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন রূপই ভিন্ন ভেদ

৩০৭ মনে করে না। আমাদের দেশের মত নহে ...। পিতা বলিলেন আমি বড়ই খুসী হইলাম। হিন্দু মুসলমান এরূপ প্রণয় ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন যত সুখের সে সুখ আর কোন সুখ নাই। কলিকাতা হইতে নাজীর সাহেব পত্র লিখিয়াছেন, তোমাকে তাঁহার বাসায় রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবেন। সমুদায় খরচপত্র তিনি দিবেন।...

৩০৯ ...লেখাপড়ার নাম কাহারও মুখে শুনিনা। ... চাঁদমিয়াঁর মুখেও না। ... সে ... কেবল দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আবার বারুণীঠাকুরাণীর সহিত অতি নির্জ্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রলাপ করেন। — আমার সহিত ঠাকুরাণীর এতদিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে। লম্বোদরী ক্ষীণ গ্রিবা ঠাকুরাণীর বহু প্রলোভনের মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বৎসর কাটাইয়াছি। গায়ের রক্ত দেহের আঘ্রান মনমজান, প্রাণমাতান ভাব, দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে আত্মমন সমার্পণ করিতে ইচ্ছা হইত, কারণ বড় বড় মহানুভব ঋষিতুল্য জ্ঞানী, পূজ্যপাদ গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ হরিহরাত্মা ...

৩১০ আমার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া বহুক্ষণ যাদু আমার পিছনে লাগিয়াই আছে। যাদু গ্রাম্য লোক নিরক্ষর নাজির সাহেব সাহেবের খানসামা বিদ্যা নাই বুদ্ধি কিছু কিছু আছে। সে একটানা ...।

৩১২ ...বড় বিবি যেমন খাপসুরাত তেমনি দেখিতে আপনার সংগে এমনি মানাইবে যে খোদাতালা যেন দুইজনকে জোড়া মিল করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। নাজির সাহেবের তিন মেয়ে — বড় মেয়ের নাম লতিফন, আর মেজটার নাম আজীজন। দুইটির বিবাহই হইবে। লতীফন বিবি ভারি খাপসুরাত, — বর্ণ সুন্দর নয়। মেজেটা বর্ণ ধবধবে সুন্দর। ... বড়বিবি ... লিখাপড়াতেও তেমনি ভাল। হেরাস তুল্লা মামুজী লিখাপড়া শিখিয়েছেন। মেজটাও পড়ত কিন্তু সে এক বছরে কখগঘ পড়তে পারলেনা। হরফ কয়েকটা চিন্তে পাল্লে না। কথ দুই অক্ষর চিন্তে পারে — লিখতে পারে — কেবল ক। লতীফন বিবি অনেক পড়েছে। ... রাতদিন লেখাপড়া নিয়েই আছেন। গায়ের রং দুধে আলতা মিশান চক্ষু দুটী মোটা কিন্তু লম্বা ছন্দ। ভ্রূদুটী ভারি খাপসুরাত। হায়রে চুল! যেমনই চুলের গোছা তেমনি লম্বা পিঠ ছেয়ে মাজা পাছা ঢেঁকে একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত পড়েছে। শরীরে আঙ্গেট কাকে দেখাই, আপনাকে বোঝাই কাকে দেখিয়ে। মানানসই লম্বা বেঁটে নহে। এমন কোন পুতন্তের পুত নাই, কি কোন মেয়েমানুষ নাই, যে লতীফন বিবির চোখ মুখ নাক হাত পায়ে একটা খুঁত বাহির করিতে পারে। সেলাইয়ের কাজ উলের কাজ খুব ভাল জানে।

৩১৩ ঘুম হইল না। ... ক্রমে চক্ষু নাসিকা বদন বক্ষ হস্তপদ সমুদায় অংগপ্রত্যংগ এমন কি সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশকলাপ ক্রমে হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিতে যুগল আঁখিদ্বয়ের কৃষ্ণরেখা সংযুক্ত নীলাভ তারা দুটি যেন ফুটিয়া আমার হৃদয়াকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

৩১৫ আমি সুখী হইব কিনা কোন পক্ষই দেখিতেছেন না। নাজীর সাহেব টাকাকড়ি না দিয়া তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ ঘরের একটি ছেলেকে ফাঁদে আটকাইতে পারিলেই তাঁহার আশা পূর্ণ।..... আমি এখন বিবাহ না করিয়াই বা কি করি? ...

৩১৮ [যাদু:] হুজুর কাল রাত্রে আমাদের সকল চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে তোমরা মীর সাহেবকে কেহই মীর সাহেব বলিয়া ডাকিতে পারিবা না। বড় দুলামিয়াঁ বলিয়া ডাকিও। আজ হইতে আপনি আমাদের বড় দুলামিয়াঁ।...

৩১৯ যদিও বিবাহ হইতে এখনও তিনমাস বিলম্ব ... মক্কার পুর চলিয়া যান ...।

৩২৫ আমি শুইলাম। চাদর খানা পরিষ্কার — ধুইয়া আইসার পর আর ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু বালিশটা খাঁটি নয়। বালিশের খোল ধবধবে। কিন্তু কাহার যেন মাথার নীচে ছিল। স্ত্রীলোকের মাথার সুঘ্রাণ তেলের অতি উত্তম ঘ্রাণ... ভাবিলাম, এ কার বালিশ আমাকে মাথায় দিতে দিয়াছে? কর্ত্তার বালিশ?

৩২৬ তাহা দিবে না। তাঁর মাথার চুলের গন্ধ এরূপ সুগন্ধিযুক্ত হইতে পারে না। ফজলে হাকমিয়াঁর স্ত্রীর বালিস! তাও নহে, তিনি শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়াছেন, অমনি মাথার বালিশটি ছাড়িয়া দিয়াছেন অসম্ভব। ফজলে হাক মিয়াঁর মধ্যম ভগ্নি সে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাইবে কেন? তাহার নিদ্রা ভংগ করিবে কেন? বাড়ীর লোকেও জানে পূর্ব হইতেই চিঠিপত্র আসিয়াছে, খবরা খবর হইয়াছে— সকলেই জানে আসিতেছে। — যার যেখানে ব্যাথা সেখানেই তার হাত। বালিশ আর কাহার নহে ...

৩৩০ যে মুখখানি খুব ফুটফুটে সুন্দর দুই ঠোটের দুই দিক বহিয়া পানের লালা পড়িয়া রঙ্গ হইয়াছে, দূর হইতে মুখের কেতা ভালরূপ দেখা গেল না, তত্রাচ যাহা নজরে পড়িল—নাক যেন একেবারেই নাই। মুখখানা গোলগাল গাড়ীর চাকার মত। তিনিই উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, আর হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছেন।... [যাদু :—] ছেলে মানুষের মত তাঁহার ব্যবহার নহে, তাঁহার ভাবি সাহেব তাহার চাইতে বয়সে বেশী, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনায় একেবারে হাল্কা, বড়ই হাল্কা, ভারিত্ব নাই। বড় বুবুজানের মত ধীর গম্ভীর নহেন। ভাবি সাহেব বড়ই হাস্‌কুটে,... আর বড় বুবুজান বাবা! তাঁহার মাতা এই সকল দেখে মেয়েকে ভয় করেন।... সামান্য কথায় যেমন মাজিলা বুবুজানেরা হাসিয়া কুটীকুটী হন, বড় বুবুজান তেমন নহেন। ... যেদিন আমরা এসেছি তার

পরদিনই···বড়মিয়া আপনার কষ্টের কথা পায়ে ফোস্কার কথা, সারাটি দিন না খাওয়ার কথা যখন তাঁহার মায়ের কাছে বলিলেন, মা বিবি ত খুব আপসোস কর্তে লাগলেন··· ।

৩৩২ মেজ বুবুজান ··· হেসে আটখানা হলেন ।····বড় বুবুজান···হাসলেন না। উঠে চলে গেলেন। ভাবি সাহেব কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন। আর বেশী হাসি হয়েছিল আপনার শোবার বালিস লইয়া। মেজ বুবুজান শুয়ে শুয়ে কেচ্ছা শুনিতেছিলেন। চাহিলে বলিলেন আমার বালিস কেউ নিও না, বলিয়াই বালিসের উপর বসিয়া রহিলেন। তাহার পর মা বিবি ভাবি সাহেবের নিকট ...চাহিলেন যে বাহিরের একটা ভদ্র সন্তান আসিয়াছে তোমার মাথার বালিসই হউক, কি অন্য একটা বালিস দাও। আমার...আছে কিন্তু বড়ই ময়লা ...। ভাবি সাহেব বলিলেন, আমার বালিসের ওয়ার ময়লা। আজ আবার তিনি আসিয়াছেন তাহার জন্য একটি মাত্র ফরসা ওয়ারের ..বলেন ত সেইটাই দিই। মা বিবি...ভাব বুঝিয়া বড় বুবুজানকে জানাইলেন।...বাক্স খুলিয়া নূতন ধোয়া চাদর, আর আপন মাথার বালিস দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন।... নূতন ওয়ার বাক্স হইতে বাহির করিয়া আরেক বালিসে পরাইয়া নিজে রাখিলেন ···। মা বিবি বড় বুবুজানের কথায় কার্য্যে কোন কথা কহেন না। তিনি জানেন বড়মিয়া অপেক্ষা, বড় বুবুজানের বুদ্ধি বেশী। নাজীর সাহেবও সময় সময় বলিতেন, যে লতিফনের

৩৩৩ বুদ্ধি বিবেচনা ফজলে হকের নাই, বিদ্যাও নাই কি করিব। বুবুজান নিজের মাথার বালিস...। আমি ভাবিলাম নূতন ওয়ার বাহির বাটীতে আপনার জন্য দিবেন। আমি পূর্ব্ব বালিস হাতে করিয়া ভাবিতেছি। কি করি, বেশী কথা বলিলে তিনি চটিয়া জান কি করি? আমি বিলম্ব করিতেই আমাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বালিস বিছানা লইয়া যা— আমি কেবল বলিয়াছি, ঐ বালিস? আর যাবে কোথা? আগুন হয়ে বলে উঠলেন—তোর বালিস! না আমার? তোর সে কথায় কাজ কিরে গোলাম ....। আমি বলি...তাঁহার হাতের লেখা আমাকে দেখাতে পার।...পরদিন যাদু আমার পা টিপিতে আসিয়া একখানা টুকরা কাগজ আমার বালিসের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল।...অক্ষরগুলি পরিষ্কার গোটা গোটা জড়ান নহে।... "কাকে বিষ্ঠা খায়--অনর্থক

৩৩৪ ডাকে। পেটে কিছু রাখে না। ছোট লোক মূর্খ যা ইচ্ছে তাই খায় পেটে রাখে না। কথা ভাল, কিন্তু সমাজ ভেদে দোষ-গুণের প্রভেদ। মূর্খের দলে বদনাম। ব্যস্ততায় নানা বিঘ্ন। কিছুই গোপন থাকিবে না। শয়ন শয্যা স্বহস্তে পরিষ্কারের আশা। যেখানেই পাইবেন, সেখানেই রাখিবেন। পাইব।—

কেহ নয়।

কালি কলম।"

৩৩৫ [সতীফন বিবি যাদুকে:] ...যা! এখন যেখানে যাচ্ছিস সেখানে যা। তিনি যখন চাহেন নাই তোকে দিব কেন? আর তিনি লেখাপড়া জানা মানুষ। এসেছেন বিদেশে, পরের বাড়ীতে আপন দোত কলম লিখার সরাঞ্জাম ছেড়ে এলেন কেন?...এ বাড়ীতে যে লিখাপড়ার নাম নাই.. তিনি জানেন না? আমি দিব না। কখনই দিব না। .. চলে যা, কিছু পাবি না।... ফজলে হাক...বলিলেন ...আপনার লিখাপড়া করা অভ্যাস...সতীফনের কাছে ভাল ভাল বাংলা কেতাব আছে, তাহা দেবে না। কেতাব কাহাকেও দেয় না।...

৩৩৭ "...আপনি বোধ হয় ব্যস্ত হইয়াছেন। বিদেশ, আপন লোক কেহই সঙ্গে নাই। আপন বলিতেও কেহ নাই—সকলেই পর—এ কয়েকটা কথা মন হইতে চিরকালের জন্য দুর করিবেন। এখানে সকলই আপনার, পর কেহই নাই। আপনার জীবনের সঙ্গিনী আপনার সুখ দুঃখের ভাগিনী যে, সেই এখানে আছে। জগতে এমন মায়া মমতা—এরূপ ভালবাসা, সম্বন্ধ কাহার সহিত নাই ও হইবে না—সেই এ বাড়ীতে আছে। ব্যস্ত হইবেন না, ধৈর্য্যগুণ বড় গুণ—বহুকালের কথা! আপনার নিকটে বলিতে লজ্জা হয়—'সবুরে মেওয়া ফলে'। আপনার উপরে—আপনার হস্তে যে আত্মমন, দেহ, জাতী কুল, মান-মর্য্যাদা সমর্পণ করিবে সেই এখানে আছে—। প্রতিদিন এক পথে বেড়াইবেন না। এই গ্রামে আবাল বৃদ্ধ সকলেই
৩৩৮ আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করে। যেখানে পান, সেখানেই রাখিবেন।

আপনারই
ল"

...লিখিলাম—

"প্রথম ছত্রে 'প্রা' লিখিয়া কাটিয়াছেন। তাহার পর—'প' লিখিয়া কাটিয়াছেন। আমার মন সন্দেহ যুক্ত নয়, খাঁটী মন। যাহা মনে তাহাই মুখে। কি বলিয়া সম্বোধন করিব? মনের কথা বলিতেছি, ঠিক করিতে পারিলাম না। আজ আপনি কিছু বলেন নাই, আমিও কিছু বলিলাম না।...আমাদের সমাজের গতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু পরিমাণে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। তাহা সমাজে কৈ? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কে? পিত'মাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন।...ভাঙ্গিয়া দেন ...। এই যে এক ভয়ানক প্রথা—ইহার জন্যই আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে।

তোমারই আমি।"

৩৩৯ রাত্র প্রভাত হইল, প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি—মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল, যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম।..

মধ্যম কন্যার বিবাহ জন্যেও ঘটক ছুটাছুটী করিতেছে।... পানীসারা গ্রামে মীর হোসেন আলীর সহিত মধ্যম কন্যার বিবাহ স্থির হইল।... সকলেই বলে মধ্যম কন্যটা হাবা—এক প্রকার পাগল। বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে, মনে হিংসা পোরা, দেখিতে খুব সুন্দরী—অর্থাৎ গায়ের রং খুব
৩৪২ পরিষ্কার সাদা ধবধবে। . বেআক্কেল—পশুর সমান।...বালীস উঠাইয়া চাদর উঠাইতেই দেখি ..প্রথম লিখা আছে, মাথা খাও পত্রখানি বুঝিয়া পড়িও। উপরি উপরি ভাবে পড়িও না—আজ মন খুলিয়া লিখিলাম। আর শীঘ্র লিখিব না।—দুইবার পড়িও।

"ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। আমি তোমার, তুমি আমার! তুমি আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী। ধর্ম্ম সূত্রে বাঁধা পড়ি নাই, তুমিও বাঁধা পড় নাই। তবে কি সাহসে এমন গুরুতর সম্বন্ধে সম্বোধন করিলাম। আমি তোমায় ভাল রূপে জানিয়াছি। আজ দুই মাস গত হয় তোমার মন পরীক্ষা করিয়াছি। তোমাকে চিনিয়াছি। আমি এ জগতে থাকিতে তুমি অন্য কাহারও হইতে পার না। আমিও মনে মনে বুঝিয়াছি স্থির করিয়াছি, তোমায় ছাড়া আমিও অন্য কাহারও হইতে পারি না। কারণ তোমার কথা অচলের ন্যায় অটল খাঁটি জবং বলবত। আমার কথা উলট পালট করিবার সাধ্য কাহারও নাই। "যদি" কথায় যেমন কথায় বাধা পড়ে, "কিন্তু" কথায় কথাটা উল্টাইয়ে দেয়। তোমার আমার কথায় "যদি"ও বসিতে পারে না, "কিন্তু" ও আসিতে পারে না। তত্রাচ বলিয়া রাখি। তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমাকে মরিতে দিও দাসীর এই ভিক্ষা।

তোমার বামে বসিতে আমার যেরূপ বাসনা, নিশ্চয় আমাকে বামে বসাইতে তোমারও সেইরূপই ইচ্ছা। আমার প্রতিজ্ঞা — ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা জীবনেও তুমি জীবনান্তেও — তুমি আমার, — মনে সুখ জন্মিল না। কথাটা চাপা দিয়ে শান্তি বোধ হইল না। মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনেও তুমি আমার স্বামী, জীবন অন্তেও তুমি আমার স্বামী। প্রাণ জুড়াইল। আজ তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমাকে দেখিবে লিখিয়াছ। তাহা বলিতে পার। কারণ আমি তোমাকে প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়া দেখি। যখনি দেখি,
৩৪৩ বোধ হয় তুমি যেন কি ভাবিতেছ! তুমি পুরুষ তোমার ভাবনা কিসের! আর যদি আমার জন্য ভাবনা, সে নিতান্তই ভুল। যে ভাবনাই হউক আমাকে লিখে জানাইও। আমিও ভাবিব। কারণ আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী। ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে আমাকে একবার দেখিতে চাও কেন? আমি কি তোমার মনের মধ্যে আঁকা নাই? যে চক্ষে দেখিতে চাও সে চক্ষের উপরে শূন্যভাবে আমার

ছায়া সর্ব্বদা তোমায় দেখিতে কি ছায়া করে নাই? সে ছায়ার ছায়া কি তোমার তোমার নয়নে পতিত হয় না? আমার আছে। তোমার থাকিবে না কেন?"

৩৪৪ [আজ বুধবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ। বিয়ে হবে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে ১৮৬৫। গায়ে হলুদ আচারাদি প্রসংগে সতীকনের নির্দেশ ছিল কেউ যেন মীর সাহেবকে অনাত্মীয়ের মতো এই আচারের বাইরে ফেলে না রাখে।

৩৪৯ সতীকনের মাতার অনুরোধে মীর সাহেবের অন্দর মহলে গেলেন]
... আমার সম্মুখে দেয়ালে একখানা বৃহৎ আয়না টাংগানো আছে — দক্ষিণ পার্শ্বে অতি নিকটে বারান্দায় একটি কামরা। বোধ হয় দুই হাত ব্যবধান। ...দ্বারে বৃহৎ একখানি পর্দ্দা ঝুলিতেছে। ... মাথা তুলিয়া নিজের ছায়া সম্মুখের দর্পণে দেখিতেছি, ... আমার পিছনের দ্বার কবাট বন্ধ। আরসীতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ঝিলিমিলি আছে, বন্ধ করা। ... পর্দ্দার মধ্য হইতে কথা আসিল ... মা... করিতেছেন। ...

৩৫২ পর্দ্দার ভিতর হইতে চিঠি পড়া শেষ হইল। কে পড়িল বুঝিতে পারিলাম না। .... "... তোমার মা নাই ... তুমি আমার পেটে সন্তান তুল্য।" আমার
৩৫৪ চক্ষে জল আসিল। ... ফজলে হক মিঁয়া আমার কথা শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার গমন দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ বৃহৎ দর্পণের দিকে আমার নজর পড়িতেই, অপরূপ এক নারীমূর্ত্তি ছায়া নজরে পড়িল। পিছনের সে খড়খড়ি যুক্ত কপাট সরিয়া গিয়াছে। ঠিক চৌকাট নিকটে যুবতী যেন আমার পশ্চাদদিকে দাঁড়াইয়াছে। অতি শুভ্র একখানা রুমাল দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ক্ষণকাল পরে চক্ষুর আবরণ খুলিল, চক্ষে চক্ষে মিলিল — চার চক্ষু একত্র হইল, চিনিলাম। হৃদয়ে অংকিত ছায়া, নিঃসন্দেহে যাহা ভাবিতাম তাহা ভাবিয়া লইলাম। দর্পণ মধ্যস্থিত যুবতীর চক্ষু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর লাল হইয়াছে। সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল ইষৎ রক্তাভ হইয়া শ্যামজ্যোতি মাঝে মাঝে চমক মারিতেছে। সেই ইষৎ লোহিত অধর ওষ্ঠে হাসী নাই। বিস্ফারিত জোড়া ভুরুযুক্ত চক্ষে আনন্দের চিহ্ন নাই। আমার মুখের উপর চক্ষু পড়িয়াই আছে। আমি সময় সময় মুখ হইতে পদতল পর্যান্ত একবার চক্ষু ফিরাইয়া আবার সেই মুখখানির প্রতি চাহিতেছি। প্রতীমাঘরের দেবীদিগের চক্ষুভাব যেরূপ স্থির, ধীর — এও সেই প্রকার। আমি আমার হৃদয় প্রতিমা দেখিতেছি। আর কথা কহিতেছি।

আমি এমনি হতভাগা যে আমার স্ত্রীকে আমি একখানা সামান্য চিরুণী পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। দর্পণে প্রতিফলিত ছায়ায় দেখিতেছি, যুবতী দক্ষীণ

হস্ত ঊর্দ্ধে উঠাইয়া ঈশ্বরকে দেখাইতেছে, সেই তর্জ্জনী অংগুলী ললাটে স্পর্শ করিল। তখনি উভয় হস্ত উভয় পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া অতি মোলায়েমের সঙ্গে সুচিক্কণ রেসমী বসনে আবৃত বক্ষঃস্থলে বামহস্তের উপর দক্ষীণ হস্ত অনেক্ষণ চাপিয়া রাখিয়া আমার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া স্থির ভাবে রহিল। পর্দ্দার মধ্য হইতে বলিতেছেন ...
৩১৫ এদিকে আমি আমার দুই হস্ত উঠাইয়া আমার হৃদয়োপরি চাপিয়া ধরিলাম, একটু পরেই দক্ষীণ হস্ত উঠাইয়া বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া দর্পণস্থ ছায়াকেই বক্ষের ধন অর্পণ করিলাম।... পর্দ্দার মধ্য হইতে কথা আসিল —। দেখিতেছি দর্পণের ছায়া যেন সরিতেছে। বিবাহের চিহ্ন — হাতে সুত্র বাঁধা —হাতে একখানা পত্র খামে মোড়া ... আঁটা। ছায়া যেন ক্রমেই অগ্রসর ... একেবারে আমার পৃষ্ঠে তাহার বক্ষঃস্থল অতি মোলায়েম ভাবে স্পর্শ করিল, অতিত্রস্তে বাহুদ্বয় দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়া পত্র আমার সম্মুখে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। আর দক্ষিণ দিকে ঘাড় নওয়াইয়া আমার কানে ২ তিনটি কথা বলিয়াই প্রস্থান, চাহিয়া দেখি, দর্পণে চাহিয়া দেখি আমার পশ্চাদ্‌দিগের দ্বার বন্ধ ...।

৩১৬ আহা যে সময় তাহার সুকোমল হস্তদ্বয় দ্বারা বাঁধিয়া এক হাত আমার কান্ধের উপর, অন্য হাত দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আমার বক্ষোপরি উভয় হাতের সম্মিলন করিয়া মাথা নওয়াইয়া রেশমী ঝুলদার বসন সজ্জিত বক্ষ আমার পৃষ্ঠে চাপিয়া সুগন্ধিপূর্ণ অনুরাগ রঞ্জিত মুখখানি আমার কানের সহিত সংযোগ করিয়া যাহা বলিবার বলিল ...। মাথার কেশগুচ্ছ সেই বালিশের সুগন্ধে পরিপূর্ণ। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, সমুদয় শেষ, দ্বার বন্ধ। এ কি ঘটিল।

..."স্বামীন! আমাদের শাস্ত্রে প্রস্তাব আর স্বীকারেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, দুইজন সাক্ষীর দরকার আর একটা প্রধান কথা মোহর আনা। ... শুক্রবার অবশ্যই হইবে। বিবাহ কথায় সকলেই খুসী হয় ...। আমার যদিও পূর্ব্বে একভাব ছিল, গতরাত্র হইতে আর একভাব হইয়াছে। কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি সে বড় ভয়ানক স্বপ্ন। ...
৩১৭ স্বপ্ন সকল মিথ্যা বলি কোন সাহসে? আমার স্বপ্ন বড়ই বিপদের স্বপ্ন। আমার জন্য ভাবিও না। তোমার জন্যই আমার বেশী ভাবনা তোমার নিকট আমার কোন কথাও গোপনীয় নাই। গোপনীয় ভাব নাই। ... কেবল লোকাচার আচার ব্যবহার কয়েকটি কাজ বাকী। ধরিতে গেলে সে কিছু নয়। আমি তোমার। আমার জন্য তুমি বিপদগ্রস্থ হও, এ কথা আমার প্রাণে সহিবে না। তোমার জন্য আমি মরি ক্ষতি নাই। আমার জন্য তুমি মর কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বনে জংগলে ঘুড়িয়া বেড়াও ইহা আমার ইচ্ছা নহে। প্রিয় প্রাণ!

প্রাণের ভালবাসা স্বামী! গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি তোমার আমার বিবাহ হইতেছে। ধর্ম্ম সাক্ষি করিয়া ...। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিক হইতে এক প্রাচীন ব্যাঘ্র আসিয়া এক লম্ফে আমার ঘাড় ভাংগিয়া লইয়া গেল। তুমি বাঘের পিছনে ২ দৌড়িয়াছ। বাঘ যেন শেষে মানবরূপ ধারণ করিল। কদাকার ভয়ানক মোটা পেট আমাকে বগলে চাপিয়া লইয়া চলিল। নিশিথ রাত্রে তুমি যে গান করিয়া থাক বাড়ীর লোক কেউ জানে না। কেহ শুনিতে পায় না। যে সময়ে তুমি গান কর সে সময় কাহার চক্ষের ঘুম ছাড়ে না। আমি প্রত্যহ শুনিয়া থাকি। ... তোমার শয়ন কামরা আর আমার শয়ন কক্ষ অতি নিকট তাহা তুমি জাননা।

"স্বপ্নে দেখা দিয়ে আজি প্রভাতেতে কান্দাইলে" গানের শেষ চরণ ... ঘুম ভাঁঙ্গিয়া গেল। তুমি নিশ্চয় জানিও আমার মনে ডাকিয়া বলিতেছে আমাদের কপালে সুখ নাই। চারিদিকে বিপদের ছায়া দেখিতেছি। যদি আমার বিপদ হয় ... কোন ভয়ের কারণ নাই। ... তুমি সাবধানে থাকিও হঠাৎ পাগলের মত কোন কার্য্য করিও না। .... সত্যই যদি আমাকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহার জন্য উতলা হইও না। এই আমার অনুরোধ। মংগলমতে বিবাহ শুক্রবার
৩৫৮ গত না হইলে আমি বিবাহের বসন ভূষণ কিছুই ব্যবহার করিব না। তুমি বর সাজিয়া বাহির বার দিও।

তোমার চিরসংগিনী

স্ত্রী—

পুনঃ আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখিয়া থাকি, তুমি আমাকে দেখ নাই। উপায় করিব বলিয়াছিলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার কিছুই করিতে হয় নাই, পাতার পত্রই তাহার মূল। মতার আন্তরিক যত্নেই আমার প্রতিজ্ঞা সফল।"

৩৬০ শুক্রবার ...।

৩৬১ ২য় বর বয়সে প্রবীন, দাড়ী গোপ মাথার চুল সমুদায় সাদা। মাঝে মাঝে এক আধটি কাল চুল, পূর্বে যে কাল ছিল তারই প্রমাণ করিতেছে। দাঁতগুলি যাহা ছিল তাহার মধ্যে অনেকেই নাই, কিন্তু সম্মুখের দুটি দাঁতের মধ্যে একটি একেবারেই নাই, ২য়টি তামার তারের বাঁধন ছাঁদনে অন্য দাঁতের সংগে পেঁচাও বন্ধনে এক প্রকার খাড়া দেখায় বটে কিন্তু কথার আঘাতে বাতাসের ঘায়ে অস্থির। যেমন পড় পড় বোধ হয়। বুক হইতে পেট পর্য্যন্ত বেহদ্দ মোট — গায়ের কাপড় পেটের উপর ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। ... একটি স্ত্রী ... তাহার পর 'খাদেমা' একজন আছেন। ... বয়স তো 'আল্লা হাফেজ' ...।

৩৬২ বড় বরের বিবাহ মন্ত্র পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি সে সময় আমিনদ্দীন মামা সাহেবকে দেখিয়া অস্থির চিত্তে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছি। তিনিও কাঁদিতেছেন।

আমি আমার মামাকে দেখিয়া অন্যমনস্ক। আমার কানে পাত্রীর নাম যেন উকিলে বলিল—লতীফননেসা...শুনিয়া যেন শুনিলাম না। হোসেন আলী সহিত... লতিফনের নাম কেন হইল ?...উকীল সাক্ষী পড়াইতে আসিলেন।...স্বীকার উক্তি অম্লান চিত্তে মুখে উচ্চারণ করিলাম। পাত্রীর নাম যে তারা উলট পালট করিবেন, তাহা আমার মনে উদয় হয় নাই।...নামের সময় আজীজননেসা শুনিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া বালিসে মাথা ঠেকাইয়া রহিলাম।...

৩৬৪ ওদিকে বাড়ীর মধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল। ডাক্তার আনিতে তখনিই দুই তিন দিকে লোক ছুটিল।...কে বার বার মূর্চ্ছা যাইতেছে।...

৩৬৬ পিতা বলিয়া দিয়াছেন .... আমার অমতে বিবাহ ! আমি সেখানে যাইব না।

৩৬৭ পুত্র-বধুর মুখ দেখিব না।..মাতামহী বলিয়াছেন ... আমি তাহাকে ঘরে আনিব। বাজার হইতে অস্থান কুস্থান যেখান হইতে যে জাতীয় মেয়ে সে ভালবাসিয়া স্ত্রী বলিয়া আনিবে আমি তাহাকে আদর যত্ন করিব ভালবাসিব। ... বিবাহের পর মুখদর্শন স্ত্রী-আচার হয় নাই। .. শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্র ১১টার সময় বাড়ীর মধ্যে আবার সোরগোল হাংগামা... শেষে শুনিলাম বড় জামাই বাবু বাটীর মধ্যে যাইয়া বসিয়াছেন পর্দ্দার আড়ালে পাত্রী ...পাত্রীর মুখের কাপড় সরাইতেই দেখিলেন...দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস বন্ধ...জামাই বাবু ঐ অবস্থা দেখিয়া...বাহিরে...আসিয়াছেন।... শেষে বলিলেন, উপরি ভাব হইয়াছে। হয় জেন নয় ভূতের আসর হইয়াছে। আমার বাটীতে দুই দিনের জন্য লইয়া যাই—কবিরাজ দ্বারা ভূতুড়ে রোজার দ্বারা ইহার দাওয়াই জড়িবুটী মন্ত্র-তন্ত্র তাবিজ না করিয়া দিলে আরাম হইবে না।...

৩৭২ বড় বিবি 'এজেন' দেন নাই। সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ নারাজিতে বিবাহ হইয়াছে।...

৩৭৬ ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রী বলিল ঐ আইনার মধ্যে নজর করুন। নজর করিতেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।... থাকিতে পারিলাম না। মাথা হেঁট করিলাম।... কলিজার কাঁপানি ...। গৌরবর্ণ কিন্তু মুখের গঠন ও ওষ্ঠ অধর চিবুক নিতান্তই কদাকার নাসিকা এক প্রকার নাই বলিলেও হয়, ভ্রূর রেখা আছে মাত্র।... চক্ষু মুদ্রিত সুতরাং চক্ষের ভাব দেখিতে আমার ভাগ্য হইল না।...দয়াময় আমার কপালে ইহাই ছিল।...

৩৭৭ আমি তন্ত্র-মন্ত্রের বড়ই ভক্ত ছিলাম। ভূত নামান, তুড়মি খেসা, সাপ ধরা ইত্যাদি কার্য্য আমি বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলাম।...

যাহারা ঐ সকল মন্ত্রতন্ত্রের বলে যাদু ইত্যাদির খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ, বুদ্ধি শক্তির চালনা ক্ষমতা একেবারে নাই বলিলেও হয়,
৩৭৮ তাঁহারা মনে মনে নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমি একজন মহা গুণিন। যাদুমন্ত্রে মহাপণ্ডিত। ...

৩৮২ বড় বিবির পীড়া আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক অধিক পরিমাণে বেশী হইয়াছে। অধিকন্তু জ্বর পেটের বেদনা, বাঁচাই মুস্কিল। ...

৩৮৩ আজ আবার বাটীর মধ্যে চলিলাম। ...

৩৮৪ বিছানা বালিশ নিতান্ত অপরিষ্কার। সমুদায় ঘরে আবর্জ্জনা ছড়ান। এখানে আগুণের ছাই, ওখানে পোড়া কাষ্ঠ খণ্ড কয়লা মুখে করিয়া পড়িয়া আছে। জল খাবার গ্লাস, অন্য ২ খাদ্যের জন্য থালা বাটী যাহা ঘরে আসিয়াছে তাহাও স্থানে স্থানে কোনটা সোজা ভাবে কোনটা ... কলসীর সম্মুখে কতক স্থান জলে ডুবিয়া আছে। দুই তিনটা পাটী কটু ভাবে ··· কোন স্ত্রীলোকের তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে ... আগুনের তাওয়ার ... ছাই ··· জলপোরা নারকলী হুকা গড়াইয়া ...দুর্গন্ধময়...কলকেটি ছুটিয়া দুহাত তফাতে ... হুক গুস ... কেহ আহার করিয়াছে... উচ্ছিষ্ট এঁটো ভাত ... কাঁটা চিংড়ির ঠেং, বেগুণের ডাটা, অর্দ্ধপেসিত লংকার খোসা, দুই একটা বীজ সহ ঐ ভাতের মধ্যে পড়িয়া লাল, লোহিত, পীত, হরিত রঙ্গের বাহার দিতেছে। ... রোগীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে ...ধাক্কা লাগিয়া তেলের বাটি অর্দ্ধ চক্রাকারে ... দুইটি মুরগী তাওয়ায় বসিয়া আপন আপন আণ্ডায় তা দিতেছে। ... কোণেই ভাঙ্গা ইট, গুড় সুরকির এক গাদা ...। [আমি :] ... "... ঘর পরিষ্কার হইতে থাকুক ..." —

৩৮৬ [বিকারের ঘোরে লতীফন :] "... সেই দুপারে আমি কিছু খাব না তবু জোর করে কাল আলকাতরা মাখা খানিক কি যেন জোর করে আমার মুখের মধ্যে দিয়া মুখ চাপিয়ে ধরেছিল। প্রাণ যায়। নিশ্বাস ফেলিতে পারিনা। কি করি ওগো আমার প্রাণ যায় কি করি। দায় ঠেকিয়া গিলিলাম। গন্ধ এমন দুর্গন্ধ যে আর বলতে পারি না ·· আমাকে অষুধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ছেলে কোলে করে সেই মীরের আসল বিবি চুপি চুপি আসিয়া বলে গেল আপনি কল্লেন কি ? চামচিকা আর কাকলাস পোড়ান, হাড় বাছা লবণতেল মাখান চাট্নী —আর তোমার বঁচওয়া নাই। ··· তোমার মরণ হবে। তিন সপ্তাহ মধ্যে
৩৮৮ তুমি মরে যাবে। . এ বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমার এই ঘরের বিছানা, আবর্জ্জনা ময়লা কাহারও চক্ষে পড়না। দুর্গন্ধ ... কথাটা কই কাহার মাথায় আসিল না ? ... (হঠাৎ মাথার উপর আমার দক্ষিণ হাতের কফিণ ধরিয়া —) এ

কে? আমার মাথায় গোলাপ দিচ্ছে! ... ভগ্নি! যিনি আমার ব্যারাম আরাম করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তিনি কৈ? এখন তাঁহাকে দেখিতে আমার কোন বাধা নাই। দুইদিন পরেই বুঝিবে। ... তুমি? ... এখন আমি তোমার ভগ্নি! ... তুমি আমার ভাই। যদি যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইতে ... পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পার ... ।"

৩৮৯ আমি চিকিৎসা করি। আহার ঔষধ ব্যবস্থা সমুদায় আমার আদেশের উপর নির্ভর। ... আমার পড়াতেল [মাথায়] দিবেন ... ।

৩৯০ যে মুখে কখনও হাসি দেখি নাই একটু হাসির আভা দেখাইয়া বলিলেন — তুমি পড়িয়া দিয়াছ? কাহার নামে পড়িয়াছ? আমি তখন তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে বসিয়া মাথায় তেল দিতে আরম্ভ করিলাম। শেষে দেখি তিনি ঘুমিয়া গিয়াছেন। ...ঘর হইতে বাহির হইতেই, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন — দেখ! তোমার নিকট আমার বলিবার কোন কথা নাই। আশীর্ব্বাদ করিও তোমার মুখখানি মনে করিতে করিতে যেন আমার মৃত্যু হয়। ... আমার অন্তিম সময় না দেখিয়া এখান হইতে যাইও না। তুমিও কি এদের সংগে পাগল হইয়াছ! ভূত-প্রেত আমার ব্যারাম ভাল করিবে? না তুমি ভাল করিতে পার? আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আমার মনে সম্ভ্রম লজ্জা কিছুই নাই। আমার কথায় আশ্চর্য্যবোধ কর না। আমার জীবন যৌবন প্রাণ সকলি তোমাকে দিয়া বসিয়াছি, — আর কোন ভাবনা আমার নাই। সময়ে আরো কয়েকটি কথা বলিব। শুনেছি ভূতড়ে কবিরাজ এসেছে, সন্ধ্যার পর ভূত আনিবে। সে সময়ে তুমি সেখানে থেক। .... মনের একটা সাধ ছিল, — সরে এস, কানে কানে বলি। মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিব। ... তুমিই আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী ... ।

৩৯১ সন্ধ্যার পর ফুল পাতা ভূত আনা। ...

৩৯২ গুপ্তভাবে আমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিয়াছে। ... আমার সহিত ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে সংমিলন হওয়ায় আমাদের বিদ্যার নিয়মানুসারে — বিধি অনুসারে আমি তাহাদের যাহা, তাহারাও আমার তাহা — প্রকাশ্যে লোকে যাহাই দেখুক। আর যাহাই বুঝুক। ...

৩৯৩ কথা বলা, দীপও দপ্ করিয়া নিবিয়া যাওয়া ভূতেরও প্রস্থান — আমি ছাড়া সকলেই হতজ্ঞান। ...

৩৯৮ লতিফন বিবি তার মাতার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছেন। কখনও জ্ঞান, কখনও অজ্ঞান, সকলের চক্ষুই জলপূর্ণ। ... লতীফন বিবি বলিতেছেন — মা! .. আমি চলিলাম, আমাকে একবার তার মুখখানি দেখাও। মরিবার সময় আরামে মরিতে পারিব। ... মা ... কৈ? তোমরা কেহই ছোট দুলা মিয়াঁকে ডাকিলে না?...

৩৯৯ লতীফন বিবি জিহ্বা বাহির করিয়া জলের সংকেত করিতেই ... তুমি
৪০০ আসিয়াছ? দেও জল দেও, আমার মুখে উঠাইয়া দেও, কোন লজ্জা নাই। আমি জগৎ ছাড়িয়াছি, কাহার ভয়? ...

৪০১ তুমি আমাকে যত চিঠি লিখিয়াছ সমুদায় একত্র করিয়া কাপড়ে মুড়িয়া তাবিজ করিয়া ঠিক হৃদয়ের উপর এই বক্ষের উপরে ঝুলাইয়া রাখিতাম। .... আমার লিখা পত্র তোমার নিকট...যত্নেই আছে আমি জানি। যদি তোমার ভাগ্যে কখনো ভালবাসা বুদ্ধিমতী স্ত্রী হয়...তাহাকে আমার ঐগুলি পড়িয়া শুনাইও।...মা! দোহাই তোমার ধর্ম্মের! তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি দোহাই তোমার খোদা রসুলের মিথ্যা বলিও না। মামু হেরাসতুল্যা দোহাই আপনার মাতাপিতার, আপনি সাক্ষী, ভাই উকীল, মাতা আমার নিকট বসিয়া, হাসান আলীর সহিত বিবাহ, আমি এজেন দিয়াছিলাম, মত প্রকাশ করিয়াছিলাম? আপনারা কি আমার উক্তি লইয়া উকীল হইয়াছিলেন?---বলুন যদি ধর্ম্ম মানেন। ...আমি স্বীকার হই নাই।...

৪০৩ মা! আজিজন সহিত আমার স্বামীর বিবাহ দিয়াছ? বিবাহ দিয়াছ সে নামের বিবাহ। আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইতে পারে না। হারাম্ হারাম্, আমি মরিব কিন্তু...আজিজন কখনই সুখী হইবে না। হইতে পারে না। ..

৪০৫ আমি তোমার। সকলই তোমার। আমার মরা লাশ অন্য কাহাকে দেখিতে দিও না। তুমি দেখিও, কারণ তুমি আমার ভাই! প্রাণের ভাই!---এস এগুয়ে এস, সময় হইয়াছে।—যাহা সাধ ছিল তাহা পূর্ণ করি—তোমার জানুর উপর মাথা রাখিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাই এই শেষ কথা,...স্বামী! প্রাণের স্বামী! আমি চলিলাম।

লা এলাহা এল্লালাহো মোহাম্মদ রসুলাল্লা। পড়িতে পড়িতে চক্ষু তারা নীচে নামিল।...মুখ বিকৃত হইল না। মাত্র ঠোঁট দুখানি একটু তর তর করিয়া নড়িয়া উঠিল।...

মৃত দেহের গোর করণ সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি হইল না, লতীফন যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহা সকলই সম্পন্ন হইল।—

তথ্য-সংকেত

১ মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, কলিকাতা ১৩১৫।

২ রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপের দৌলতে ১৯৫৬ সালে একবার মার্কিন মুলুকে যাওয়ার পথে এবং আরেকবার ১৯৫৮তে মার্কিন মুলুক থেকে ফেরার পথে চার হপ্তা কোরে দুবারে মোট আট হপ্তা লণ্ডনে বই ঘাঁটার সুযোগ পাই। এই সময়ে মীর সাহেবের গ্রন্থটি কমনওয়েলথ রিলেশনস লাইব্রেরীতে পাঠ করি। এই সুযোগ লাভের জন্য আমি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৩ প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা, কলিকাতা ১৩৫৩।

৪ বিপিন বিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসংগ, কলিকাতা ১৩২০।

৫ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্রোহে বাঙ্গালী, কলিকাতা ১৯৫৭। প্রথম প্রকাশ ১২৯৮—১৩০৩, মাসিক জন্মভূমিতে।

৬ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা ১৩১১।

৭ রাস সুন্দরী দাসী, আমার জীবন, কলিকাতা ১২৭৫।

৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত), কলিকাতা ১৮৯১।

৯ দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্মজীবন-চরিত, কলিকাতা ১৩০৩।

১০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৮৯৮।

১১ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৯০৯।

১২ নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, পঁচ খণ্ড, কলিকাতা ১৯০৮—১৯১৩।

১৩ মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, ১৯০৯—১৯১০।

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ১৯১১—১৯১২।

১৫ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস [সচিত্র], কলিকাতা ১৯১৫।

১৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৯১৮।

১৭ প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৸/০।

১৮ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

১৯ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৫৫ মাঘ, পৃঃ ২৮২—২৮৩।

২০ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃঃ ১৪৬-৭।

২১ ঐ, পৃঃ ১৪৮।

২২ বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য), বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৪৪ ফাল্গুন। এই সংগ্রহে মুদ্রিত বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)-এর বিজ্ঞাপন।

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্র পূজা, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৬১, পৃঃ ১৬-১৭।

২৪ গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৫, পৃঃ ১৭২, দ্রষ্টব্য।

২৫ বিদ্রোহে বাঙ্গালী, পূর্বোক্ত, ভূমিকা পৃঃ /০।

২৬ বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭।

২৭ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭-৬৮।

২৮ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃঃ ৮।

২৯ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কাব্যমালা, ১৩২৭, পৃঃ ৬৫।

৩০ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৩১ ঐ, পৃঃ ৩২৫।

৩২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৭৫, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃঃ ৪১।

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, বিশ্বভারতী ১৩৫৫, পৃঃ ১০৫।

৩৪ শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়রী, কলিকাতা ১৩৬৪, পৃঃ ১৯।

৩৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, এবং রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯-১০১।

৩৬ Brown, E. P., Arranged & Compiled, *The Critical Opinions of Samuel Johnson*, Princeton University Press, 1926, pp. 25-26.

৩৭ ঐ।

৩৮ ঐ।

৩৯ সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৯৫৬। লেখক সোমেন বসু ৩য় পৃষ্ঠায় বলেছেন, "আত্মজীবনী শুধু ইতিহাস নয়, আত্মজীবনী ঘটনা পারম্পর্য রক্ষিত ধারাবাহিক জীবনকথা নয়, আত্মজীবনী মানুষের হয়ে ওঠার কাহিনী।" এই সংজ্ঞা সার্থক জীবনী সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য বোলে আমরা মনে করি। সোমেন বসুর বইটি বর্তমান প্রবন্ধ রচনা শেষ হবার পর হাতে পড়ে। সাধারণ বিষয়বস্তু এক হলেও, আমাদের উভয়ের আলোচনার রীতি এক নয়। সিদ্ধান্ত সমূহও পৃথক। তাছাড়া গোটা তিনেক বই ছাড়া ওঁর ও আমার আলোচনার এলাকা ঐক্যহীন। এসব মনে কোরে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিলম্বে হলেও প্রকাশ কোরতে কুণ্ঠিত হলাম না।

৪০ Nicolson, H., *Developement of English Biography*, London, 1927, p. 15.

৪১ নবীন সেন, আমার জীবনী, ১ম খণ্ড, ১৯০৮, পৃঃ ৬০।

৪২ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২-৪৩।

৪৩ Maurois, Andre'; *Aspects of Biography*, Cambridge, 1929, Chapter 5 pp. 131-160.

৪৪ শরীরকে সাহিত্যে স্থান দিতে বাঙালী লেখক নিতান্ত কুণ্ঠিত ও নারাজ। বিলেতের ভিক্টোরীয় সাহিত্য এবং স্বদেশের ব্রাহ্ম চিন্তানায়কদের অপরিমিত শালীনতা পূজার প্রভাবই হয়তো আমাদের সত্যদমনের স্পৃহাকে জিইয়ে রেখেছে। দ্রষ্টব্য, শিবনারায়ণ রায়, সাহিত্য চিন্তা, পৃঃ ৬১-৬২।

৪৫ মীর মশার্‌রফ হোসেন, উদ্‌াসীন পথিকের মনের কথা, কলিকাতা, ১৮৯০, ষড়বিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১৩৪-১৩৮।

৪৬ মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।